শতাব্দীর সূর্য
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ।।

শতাব্দীর সূর্য

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনী, ধর্ম ও কর্মের আলোচনা]

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

●

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশক—
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে
প্রকাশিত চতুর্থ সংশোধিত সংস্করণ

মূল্য পাঁচ টাকা (৫·০০)

২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮

মুদ্রাকর : শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

উৎসর্গ

যাঁর জয়ধ্বনি করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—'কালের তরীতে আমরা প্রায় একঘাটে এসে পৌঁচেছি, কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।'—সেই জ্ঞান-তাপস **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের** পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার এ ক্ষুদ্র অর্ঘ্য অর্পণ করলাম।

—দক্ষিণারঞ্জন বসু

SATABDIR SURYA

(The Sun of the Century :
Life and Appreciation
of RABINDRA NATH TAGORE)

By DAKSHINA RANJAN BOSE

Price : Rs. 5·00 (Rupees Five) only

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসকে এক হিসাবে বিগত একশো বছরের ইতিহাস বলে উল্লেখ করলেও অত্যুক্তি হয় না। বিরাট পটভূমিতে এমন বিস্তৃত জীবনপ্রবাহের ধারানুক্রমিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যেমন দুঃসাধ্য, তার বিভিন্ন দিকের আলোচনাও তেমনি দুঃসাহসিক। রবীন্দ্রপ্রতিভার এক একটি দিক নিয়েই বিরাট এক একখানি গ্রন্থ রচিত হতে পারে। তথাপি অল্প পরিসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও ধর্মের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এতে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, সফল হয়েছি কিনা সে বিচারের ভার পাঠকদেরই।

নিজের বইয়ের পাতায় স্থান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চলতি কথাকে সম্মানিত করেছেন, আর তা তিনি পছন্দও করতেন। তাই তাঁর জীবনকথা আলোচনায় শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে তাঁরই প্রদর্শিত পথকে বেছে নিয়েছি ভাষার দিক থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বানান পদ্ধতিকে যথাসাধ্য অনুসরণ করেছি। এ বিষয়ে বিচ্যুতি যে কিছু না ঘটেছে, এমন কথা বলতে পারিনে। তাড়াতাড়িতে মুদ্রণ-প্রমাদও হয়ত কিছু রয়ে গেল। তার জন্যে ত্রুটি স্বীকার করছি।

এই পুস্তক সংকলনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখিত বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি থেকে যে সাহায্য নিতে হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। তবে এ বিষয়ে প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' ও ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা'র কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। বন্ধুবর সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃতী ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রচেষ্টায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। পরমস্নেহাস্পদ উদীয়মান কথা-সাহিত্যিক শ্রীমান সন্তোষকুমার ঘোষের সহযোগিতা ছাড়া পুস্তকটি এত শীঘ্র প্রকাশ করা সম্ভবই হতো না।

পুস্তকখানিকে মনোরম রূপদানে প্রকাশক মহাশয় চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেননি এবং কাগজের অস্বাভাবিক মহার্ঘতা সত্ত্বেও বইখানার পূর্বনির্ধারিত দাম বজায় রেখে আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন।

আমি এঁদের সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

২৬শে ভাদ্র ১৩৪৮ সাল

—গ্রন্থকার

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে জন্মেছিলেন ; কিন্তু তাঁর যশোসূর্যের আলোক এদেশের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সমস্ত পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর জীবনকথা প্রত্যেক বাঙালীরই জানা প্রয়োজন। এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যও তাই। তাঁর জীবনী আলোচনায় সাল তারিখকে ততখানি প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাগুলিকেই সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়েছে, আর করা হয়েছে তাঁর কর্ম ও ধর্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।

এই পুস্তকের লেখক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসুর নতুন করে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তিনি বাঙলা দেশের অন্যতম প্রখ্যাত কবি, কথা-সাহিত্যিক এবং প্রবন্ধকার। 'যুগান্তরে'র বার্তা-সম্পাদকরূপে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তিনি স্বনামধন্য। জীবনীকার হিসাবে বাংলার বিশিষ্ট মনীষীদের জীবনকথাকে তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করে যশস্বী হয়েছেন। 'শতাব্দীর সূর্য' রচনায় তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করেছেন ; কাজেই এই গ্রন্থখানি পাঠকসমাজে আদরণীয় হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

পরিশেষে বক্তব্য এই, বইটির কলেবর বৃদ্ধি করায় এবং কাগজের মহার্ঘতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে এর রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংস্করণের মূল্য আরো কিছু বাড়াতে হলো।

—প্রকাশক

চতুর্থ সংস্করণের কথা

'শতাব্দীর সূর্য' বাংলা দেশের পাঠকদের প্রীতি অর্জন করেছে। প্রথম সংস্করণের ন্যায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি। কবিগুরুর তিরোধানের পর তাঁর জীবন-কথা অবলম্বনে রচিত প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ 'শতাব্দীর সূর্য'। সেই গ্রন্থের এমন লোকপ্রীতি অর্জনের মূলে বিশ্বকবি সূর্যের যে চির উজ্জ্বল কীর্তিপ্রভা পাঠকমহলে তার প্রতিক্ষেপণের ভার নিয়েই আমার আত্মতৃপ্তি।

ইতিমধ্যে বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রচর্চা সুদূর প্রসারিত হয়েছে। আমার প্রথম প্রচেষ্টায় যে অসম্পূর্ণতা ছিল এই সংস্করণে তাকে পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করেছি। সূর্যালোক যেমন পৃথিবীর নিভৃততম ধূলিকণাকেও স্পর্শ করে যায়, রবীন্দ্রনাথের জীবনকথার অমৃত প্রবাহ বাংলার গণমানসকেও তেমনি স্নিগ্ধ কর-স্পর্শে আলোড়িত করে দিয়ে গেছে। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণে আমি সেই ব্যাপক পরিধিকে পাঠক সমাজের সামনে আমার সীমিত সাধ্যে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এবার আরও কয়েকটি অধ্যায় নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে এবং অন্যান্য অধ্যায়েরও পরিবর্ধন, পরিবর্জন ও সংশোধন করা হয়েছে।

এই দায়িত্ব পালনে আমি সমকালীন রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষজ্ঞদের গবেষণা ও সাধনা থেকে অনেক আলোক লাভ করেছি। তন্মধ্যে অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু ও ডক্টর আদিত্য ওহদেদারের নানা রচনা উল্লেখযোগ্য। এঁদের কাছে আমি ঋণ স্বীকার করে শতাব্দীর কবিকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণতি।

২৫শে বৈশাখ
১৩৬৮ সাল

গ্রন্থকার

সূচিপত্র

জন্মদিনে

বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে
দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে।
একদা নূতন বর্ষ অতলান্ত সমুদ্রের বুকে
মোরে এনেছিল বহি
তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে
দিক হতে যেথা দিগন্তরে
শূন্য নীলিমার 'পরে শূন্যে নীলিমায়
তটকে করিছে অস্বীকার।
সেদিন দেখিনু ছবি অবিচিত্র ধরণীর—
সৃষ্টির প্রথম রেখাপাতে
জলমগ্ন ভবিষ্যৎ যবে
প্রতিদিন সূর্যোদয়-পানে
আপনার খুঁজিছে সন্ধান।
প্রাণের রহস্য-ঢাকা
তরঙ্গের যবনিকা-'পরে
চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম,
এখনো হয়নি খোলা আমার জীবন-আবরণ—
সম্পূর্ণ যে-আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটেনি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।
শুধু করি অনুভব,
চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে॥

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তা'র ভরি' তীব্র বিষে।

—রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [শিল্পী : নির্মল দত্ত
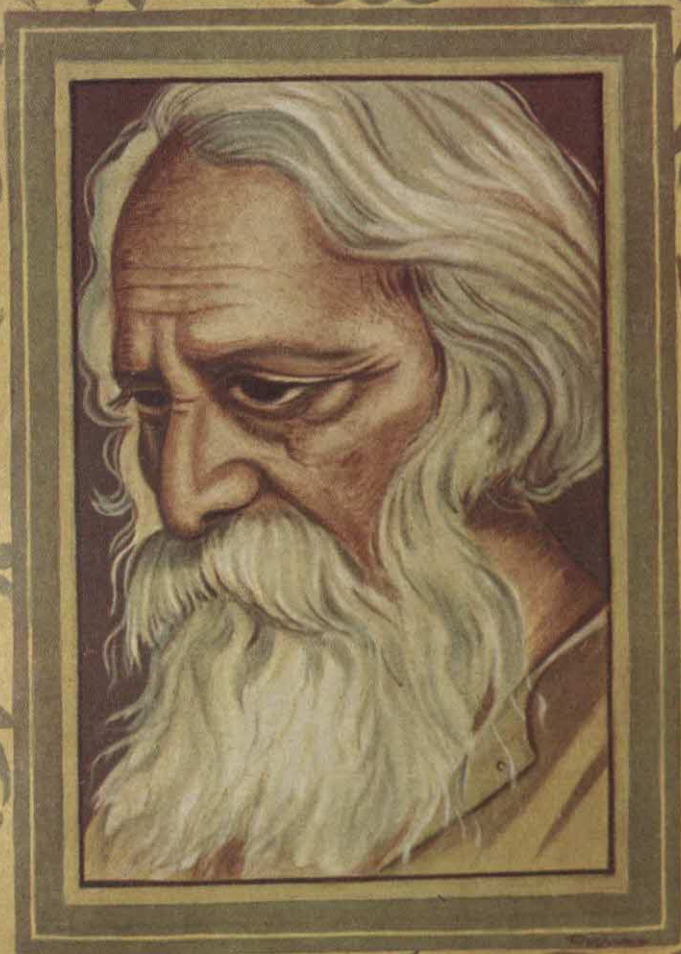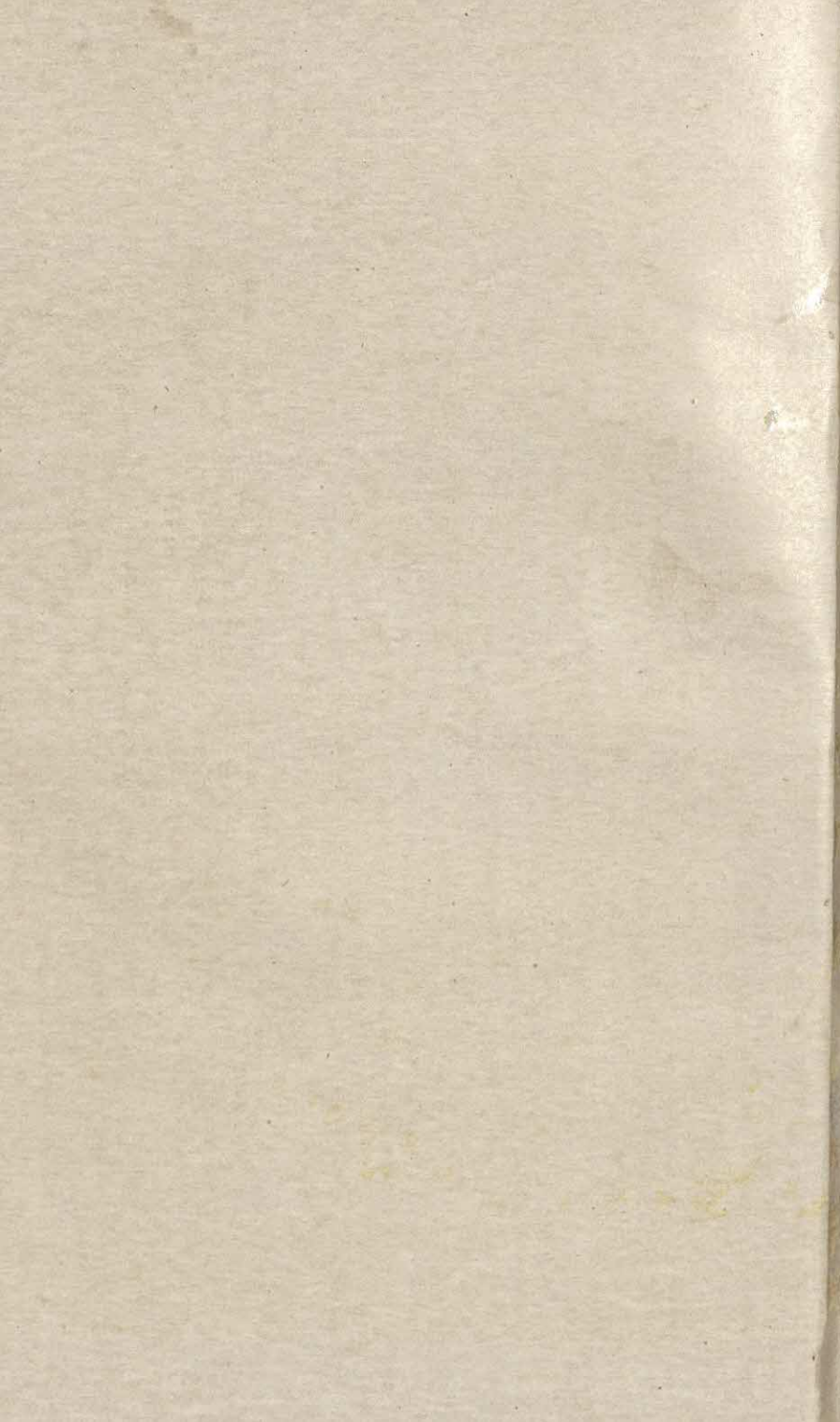
শতাব্দীর সূর্য

রবীন্দ্র-জীবনী

অনন্ত কাল, মহাসমুদ্র আর মহাকাশের মতোই রবীন্দ্রনাথের কোনও পরিমাপ সম্ভব নয়। তাঁর নামোচ্চারণ বিশ্ববাসীর কানে ইন্দ্রজালের মোহ সৃষ্টি করে। বুদ্ধিদীপ্ত বিরাট গৌরদেহ, অসংখ্য কর্মে উৎসর্গীকৃত জীবন এবং ঋষিতুল্য শান্ত অথচ অটল ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি ছিলেন আমাদের বিস্ময়। সমসাময়িক ইতিহাসে তাঁর কোনও তুলনা নেই। গেটে আর সেক্সপীয়র, হোমার আর দান্তের মতো তাঁর নামও চিরকালের খাতায়, কালের কপোল-তলে শুভ্র এবং সমুজ্জ্বল। তিনি অনন্য। বাংলার জাতীয় জীবনে তিনি বলিষ্ঠতা এনেছেন। তাঁর সাহিত্য পেয়েছে বিশ্ব-সাহিত্যের মর্যাদা। বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছে যত ঋণী, কোনও বিশেষ সাহিত্য কোনও লেখকবিশেষের কাছে তত নয়। মাতৃঋণের মতো এ ঋণও অপরিশোধ্য। প্রাচ্য আর প্রতীচ্যকে তিনি একটি বন্ধন-সূত্রে গ্রথিত করেছেন। তাঁর কাব্য মিলনের, মৈত্রীর কল্যাণের। যেখানে অকল্যাণ সেখানেই তাঁর উদ্ধত তর্জনী, যেখানে অন্যায় সেখানেই তিনি রুদ্র। অসুন্দরের সঙ্গে তাঁর কোনও সন্ধি নেই। এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধের অজস্রতা তিনি সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন, ভালোবেসেছেন, অমৃতময়ী বাণী বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বার বার পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁকে পেয়ে আমরা বিশেষভাবে ধন্য, কেননা এই দেশেই তাঁর জন্ম, এই দেশের সূর্যালোকেই তাঁর প্রতিভা-'নির্ঝরে'র ঘটেছে 'স্বপ্নভঙ্গ'।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন সেকেলে কলকাতায়, একশ' বছর আগে ১৮৬১ সালের ৮ই মে, বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ। তাঁর পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তখনকার কলকাতার সঙ্গে এখনকার কলকাতার অনেক তফাৎ। তাঁর কথাতেই বলি,—"না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর গাড়ী। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পাল্‌কি চড়ে কেউ বা ভাগের গাড়ীতে।... তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি। কেরোসিনের আলো পরে যখন এলো তার তেজ দেখে আমরা অবাক।...তখন জলের কল বসেনি। বেহারা বাঁকে করে কলসি ভরে মাঘ-ফাগুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল।...তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত।...আমাদের সেকালে দিন ফুরলে কাজকর্মের বাড়্‌তি ভাগ যেন কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়তো শহরের বাতি-নেবানো নিচের তলায়। ইডেন গার্ডেনে গঙ্গার ধারে শৌখিনদের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে ফের্‌বার গাড়িতে সইসদের হৈ হৈ শব্দ রাস্তা থেকে শোনা যেত। চৈৎ বৈশাখ মাসে রাস্তায় ফেরিওয়ালা হেঁকে যেতো "বরীফ"।... আর একটা হাঁক ছিল "বেলফুল"। বসন্ত কালের সেই মালীদের ফুলের ঝুড়ির খবর আজ নেই, কেন জানিনে।...ট্রামের পায়দানের উপর ভিড় করে কলেজ আর আপিস ফেরার দল ফুটবল খেলার মাঠে ছুটত না। ফের্‌বার সময় তাদের ভিড় জম্‌ত না সিনেমা হলের সাম্‌নে।...আগেকার কালটা ছিল যেন রাজপুত্তুর। মাঝে মাঝে পালপার্বণে আপন এলাকায় করতো দান-খয়রাৎ। এখনকার কাল সদাগরের পুত্তুর, হরেক রকমের ঝক্‌ঝকে মাল সাজিয়ে

বসেছে সদর রাস্তার চৌমাথায়। বড়ো রাস্তা থেকে খদ্দের আসে, ছোট রাস্তা থেকেও।"

এহেন কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের জন্ম হলো ঠাকুর পরিবারে। কলকাতার ঠাকুর পরিবারের নাম সর্বত্র সুপরিচিত। এদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার গঙ্গাধারার এঁরাই ভগীরথ। প্রতীচীর শিক্ষার উৎকৃষ্ট অংশটুকু এই পরিবারের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত, আবার প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্যের কথাও এঁরা বিস্মৃত হননি। বৃহৎ এই দু'টি আপাত-বিরোধী সভ্যতার অপূর্ব সমন্বয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও। তাঁর উপর এই পরিবারের প্রভাব যে অনেকখানি, একথা উল্লেখ করাই বাহুল্য।

ঠাকুরেরা শাণ্ডিল্য গোত্র এবং রাঢ়ী শ্রেণীর। কুলশাস্ত্রের নির্দেশ মতে এঁরা কুশারী। ঘটনাচক্রে এঁরা 'পিরালী' ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হলেন। এই বংশের পঞ্চানন নামে আদিপুরুষ যশোহর জেলা থেকে কলকাতায় আসেন। আশে-পাশে নিম্নজাতীয়েরা বাস করতো। তারা পঞ্চাননকে ভক্তিভরে ডাকতো 'ঠাকুর' বলে। এই 'ঠাকুর' পদবী আবার পরবর্তী কালে য়ুরোপীয়দের মুখে 'টেগোর' রূপে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পঞ্চাননের দুই পৌত্র, নীলমণি আর দর্পনারায়ণ। প্রথম জন থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, আর দ্বিতীয় জন থেকে পাথুরেঘাটার ঠাকুর পরিবার উদ্ভূত।

ছেলেবেলা

একেবারে ছেলেবেলা রবীন্দ্রনাথের কেটেছে চাকরদের মহলে। একান্নবর্তী বিরাট পরিবারের গৃহিণী মাতা সারদা দেবী। শিশু পুত্রকে দেখাশুনা করার তেমন বেশি সময় ছিল না তাঁর। কাজেই কবির শৈশবের ভার একান্তভাবেই গিয়ে পড়েছিল বাড়ির চাকর-

নীলমণির পৌত্র
দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪ — ১৮৪৬)
দেবেন্দ্রনাথ
১৮১৭—১৯০৫
গিরীন্দ্রনাথ
১৮২০—১৮৫৪
নগেন্দ্রনাথ
১৮২৯—১৮৫৮
একটি কন্যা, অল্প বয়সে মারা যায়
দ্বিজেন্দ্রনাথ
১৮৪০-১৯২৬
সত্যেন্দ্রনাথ
১৮৪২-১৯২৩
হেমেন্দ্র
১৮৪৪-১৮৮৪
বীরেন্দ্র
১৮৪৫-১৯১৫
সৌদামিনী
১৮৪৭-১৯২০
জ্যোতিরিন্দ্র
১৮৪৮-১৯২৫
স্বকুমারী
১৮৪৯-৬৪
পুণ্যেন্দ্র
শরৎকুমারী
স্বর্ণকুমারী
১৮৫৫-১৯৩২
বর্ণকুমারী
সোমেন্দ্র
রবীন্দ্রনাথ
১৮৬১-১৯৪১
বুধেন্দ্র
মাধুরীলতা (১৮৮৬-১৯১৮)
= শরৎ চক্রবর্তী
(সন্তানহীনা)
রথীন্দ্র (জন্ম ১৮৮৮)
= প্রতিমা
রেণুকা (১৮৯০-১৯০৪)
= পরলোকগত
ডাঃ এস্. এন্. ভট্টাচার্য
মীরা (জন্ম ১৮৯২)
= নগেন্দ্র গাঙ্গুলী
শমীন্দ্র (১৮৯৪-১৯০৭)
নিত্যেন্দ্র
(১৯১১-১৯৩৬)
নন্দিতা (জন্ম ১৯১৭)
= কৃষ্ণ কৃপালিনী

বাকরদের ওপর। অনেক সময় ভৃত্য-শাসকদের হাতে অনেক গঞ্জনাও ভোগ করতে হয়েছে শিশু রবিকে। খড়ির গণ্ডী কেটে চোখ রাঙিয়ে তার ভিতর তাঁকে বসিয়ে রেখে যে যার হয়ত এদিক ওদিক চলে গেল। বহুক্ষণ চলে যায় কারুর কোন খোঁজ-খবর নেই। সীতা-হরণের কাহিনী মনে পড়ে যায় শিশু রবির। তাই তিনি ভয়ে ভয়ে বসেই থাকতেন শেষ পর্যন্ত সেই খড়ি-আঁকা গণ্ডীর মধ্যে। এসব কথাই কবি পরে তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখেছেন এবং তাঁর শৈশবকে কৌতুক করে 'ভৃত্যশাসনের যুগ' বলে বর্ণনা করেছেন। এ সময়টায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও তাঁর তেমন যত্ন হতো না বলে তিনি বলেছেন।

লেখাপড়া শেখার বাঁধা-ধরা নিয়মের প্রতি তাঁর যে বিরাগ, সেটা সহজাত। তাঁর বয়সী ছেলেরা যখন I am up আর He is down-এর অর্থ মুখস্থ করেছে, তিনি তখনো বি, এ, ডি, ব্যাড; এম, এ, ডি, ম্যাড পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন নি। চাকরদের মুখে শুনছেন ভূতুড়ে গল্প, কখনো করছেন কুস্তি। কুস্তির পরে মায়ের তাড়নায় দলন-মলন চলত। কেন না, তাঁর মায়ের ভয় ছিল, পাছে ছেলের রঙ হয়ে যায় কালো। "এদিকে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে একটা গুজব চলে আসছে যে, জন্মমাত্র আমাদের (ঠাকুর) বাড়িতে ছেলেদের ডুবিয়ে দেওয়া হয় মদের মধ্যে, তাই রংটিতে সাহেবি জেল্লা লাগে।"

গৃহশিক্ষক আসতেন, কিন্তু পড়ায় রবীন্দ্রনাথের মন ছিল না। বই-শ্লেট নিয়ে বসে যেতেন টেবিলের সামনে। মুখস্থ বিদ্যে ফসকিয়ে যেতে চায়, আর মাষ্টার তাঁর ছাত্রের বুদ্ধি নিয়ে যে মত জারী করেন, "সেটা পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মত হয় না।...মেয়েদের তখন ইস্কুলে যাবার তাগিদ ছিল না। মনে হতো মেয়ে জন্মটা নিছক সুখের। বুড়ো ঘোড়া পাল্‌কি গাড়িতে করে টেনে নিয়ে চলতো আমায় দশটা-চারটার আন্দামানে।"

রাত্রিবেলার কথা লিখেছেন, "পড়্‌তে পড়্‌তে ঢুলি, ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে চম্‌কে উঠি।"

শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহর্ষির বিশেষ স্নেহের পাত্র। মাতৃভাষার প্রতি পিতার গভীর শ্রদ্ধা ও ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যের অগাধ অনুরাগ যে তাঁকে শিশু-বয়স থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বাড়ির মাষ্টারের কাছে বা ইস্কুলে যাই শিখুন না শিখুন, মহর্ষির কাছে মুখে মুখে তিনি শিখেছিলেন ঢের। রবীন্দ্রনাথকে প্রায়ই ইস্কুল বদলাতে হতো। প্রথমে 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী', তারপর 'নর্মাল ইস্কুল' এবং পরে 'বেঙ্গল একাডেমি' নামে ফিরিঙ্গি ইস্কুলে তাঁকে পড়তে হয়। বাড়িতে তাঁর পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল প্রাথমিক পদার্থবিদ্যা, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, এমন কি শরীরতত্ত্ব। তা'ছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইংরেজি, বাংলা তো ছিলই। উপরন্তু হিসাবে তিনি শেখেন গান। এদিকে শরীর-চর্চাও করতেন। 'বেঙ্গল একাডেমি'তে রবীন্দ্রনাথ বেশি দিন পড়েন নি, কিছুদিন পরেই শুরু করলেন ইস্কুল পালানো। এর কারণ বিদ্যার প্রতি বিরাগ নয়। ইস্কুলের বন্দিদশা রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগতো না মোটেই।

এগারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হলো। ইতিপূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরে ২০ বিঘে জমি কিনেছিলেন, যেখানে পরে শান্তিনিকেতনের উদ্ভব। উপনয়নের পর রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির সঙ্গে বোলপুরে যান। তারপর সেখান থেকে তাঁরা সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ করবার জন্যে বা'র হলেন।

বোলপুর থেকে সাহেবগঞ্জ। তারপর দানাপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি দেখে তাঁরা অমৃতসরে পৌঁছান। অমৃতসরে মাসখানেক থেকে ড্যালহৌসি পাহাড়ে গিয়ে থাকেন মাস চারেক। এই সময়টা রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির কাছে নিয়মিত সংস্কৃত ব্যাকরণ আর

ইংরেজি তো পড়তেনই—প্রাথমিক জ্যোতির্বিদ্যার পাঠও তাঁকে নিতে হতো। ১৮৭৪ সালে কলকাতায় ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হলেন সেন্টজেভিয়র্স ইস্কুলে। পরের বছর তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৪ বছরও পূর্ণ হয়নি, স্নেহময়ী জননী সারদা দেবীর মৃত্যুজনিত অভাব সঙ্গে সঙ্গে যথার্থভাবে উপলব্ধি করবার মতো সে বয়স নয়। কবি নিজেই পরে এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "মা'র মৃত্যু যখন হয় আমার বয়স অল্প। অনেক দিন থেকেই তিনি ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবন সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল জানিতেও পারি নাই। এতদিন পর্যন্ত যে ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়—তাহার পরে বাড়িতে ফিরাইয়া আনা হয়। একদিন রাত্রে আমরা ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল 'ওরে তোদের কি সর্বনাশ হলো রে'...। প্রভাতে উঠিয়া যখন মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম তখনো সে কথাটির অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাইরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর, সে দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না। সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখ-সুপ্তির মতই প্রশান্ত ও মনোরম। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনি শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরণার মধ্যে আপন আসনটিতে নামিয়া আসিবেন

না।" এই বেদনার অনুভবই মায়ের স্মরণে রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে অন্যত্র ব্যক্ত হয়েছে—

তিমির দুয়ার খোলো···
জননী জীবন জুড়াও
তব প্রসাদ সুধা সমীরণে।

এদিকে মহর্ষিও ক্রমে ক্রমে একেবারে সংসারবিমুখ উদাসীন হয়ে উঠলেন। মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত বালক রবীন্দ্রনাথ এমনি করে পিতার আদর থেকেও ধীরে ধীরে দূরে পড়ে গেলেন।

প্রথম রচনা

একেবারে শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা রচনার অভ্যাস ছিল। 'প্রথম ভাগ' পাঠকালে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে', এই দু'টি লাইনের মিল তাঁর মনে গভীর রহস্যময় স্পন্দন এনে দেয়। একথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে। বাইরের সঙ্গে কোন যোগই ছিল না তাঁর সারা শৈশব। কল্পনাপ্রবণ শিশু রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র একটা আবহাওয়ায় স্বভাবতই সঙ্গীবিমুখ হয়ে পড়লেন। তাই তাঁকে আমরা খুঁজে পাইনা সমবয়সীদের হৈ-হল্লা ও খেলাধূলা বা মারধরের মধ্যে, তিনি ঘরে বসেই 'ডাকঘরে'র বালক অমলের মতো এসব দেখছেন, নয় তো চিন্তার রাজ্যে উদাসমনে বিচরণ করছেন। 'বউ কথা কও ডাক্‌ছে তো ডাক্‌ছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই। এই সঙ্গে আমার খাতা ভরে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছে পদ্যে।' সাত-আট বা নয় বছরের শিশু রবির সে সব পদ্য মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই।
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই॥

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে।
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে॥

বাস্তবিক পক্ষে দারুণ গ্রীষ্মের পর বরষা কার মনে না ভরসা আনে। কিন্তু এতটুকু শিশুর সে অনুভূতি লাভ এবং তাকে আশ্রয় করে পদ্য রচনা করা, তা অসম্ভব না হলেও অভাবনীয়। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁর কবিতা প্রথম ছাপা হয় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায়। কবিতাটির নাম 'অভিলাষ', রচনা প্রায় বারো বছর বয়সে। ত্রুটিহীন ছন্দে রচিত এবং সুশৃঙ্খল ভাবপূর্ণ কবিতাটি কোনও বারো বছর বয়সের ছেলের রচনা, একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে। এগারো বছর বয়সেও তিনি 'পৃথ্বিরাজ পরাজয়' নামে একটি বীররসাত্মক কাব্য রচনা করেছিলেন, কিন্তু কোথাও তা প্রকাশিত হয় নি এবং একমাত্র 'জীবন-স্মৃতি'তে তার সামান্য উল্লেখ ছাড়া অন্যত্র তার কোন হদিসই পাওয়া যায় না।

বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গৃহে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা অমূল্য। গৃহশিক্ষকের কাছে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক এবং ইংরেজি সাহিত্য পড়া অব্যাহতই চলেছিল। ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে প্রধানত সেক্সপীয়র পড়েছিলেন বলেই বোধ হয়, কেননা এই সময়েই তিনি 'ম্যাকবেথ' নাটকের বাংলা তর্জমা করেন। আর সংস্কৃত কাব্য-নাটকের মধ্যে অন্তত কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' তিনি খুব ভাল করেই পড়েছিলেন। কারণ তাঁর ১৪ বৎসর বয়সে রচিত 'বনফুল' নামক কাব্যে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'এর প্রভাব সুপরিস্ফুট।

অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংস্পর্শ লাভ রবীন্দ্রনাথের জীবনের আর একটি বড়ো ঘটনা। বয়সের পার্থক্য ছিল বারো বছরের। কিন্তু 'জ্যোতি-দাদা' এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। 'বয়সের এত দূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম এই আশ্চর্য।' অথচ কী স্বাধীনতাই না পেয়েছেন তিনি এই দাদার কাছে। "জ্যোতি-

দাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমায় কোন বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককে শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তা হলে ভেঙেচুরে তেড়ে বেঁকে যা হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের পক্ষে সন্তোষজনক হ'ত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হ'ত না।" এ যথার্থই একেবারে খাঁটি কথা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক লিখতেন, রবীন্দ্রনাথ তাতে দিতেন গান। 'সরোজিনী' নামে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের একটি স্বাদেশিকতাপূর্ণ নাটকের জন্যেও রবীন্দ্রনাথ একটি গান রচনা করেন।

কিছুকাল পরে তিনি 'বনফুল' কাব্য-উপন্যাস রচনা করেন। এই কাব্য-উপন্যাসখানি আটটি সর্গে বিভক্ত। এটি ১৮৭৬ সালে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয়। 'বনফুলে'র পরেই 'পলাশ' কাব্য। শৈশব সঙ্গীত নামেও কিশোর কবির কয়েকটি গাথা একত্রে প্রকাশ করা হয়েছিল। তবে এখন তা দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু এ সময়কার রচিত কবিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখা গেছে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনায়। বস্তুত 'ভানুসিংহ রবীন্দ্রনাথেরই ছদ্মনাম। বৈষ্ণব কবিতার ঢঙ-এ ও ভাষায় কবিতাগুলি রচনা করা হয়েছিল। ভাবের পরিণতিতে, ছন্দের লালিত্যে এই কবিতাগুলি যে কোনও অল্পবয়সী বালকের রচনা, একথা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়।

১৮৭৬ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সঙ্গে দ্বিতীয়বার হিমালয় প্রবাসে গিয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' নাটকের পুরো দমে মহড়া চলেছে। রবীন্দ্রনাথকে নিতে

হলো 'অলীক বাবু'র ভূমিকা। সম্ভবত রঙ্গমঞ্চে এইটেই তাঁর প্রথম অভিনয়। পরবর্তীকালে দেখা গেছে কী চমৎকার অভিনেতা ছিলেন তিনি। তাঁর অভিনীত চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠতো।

এ সময়ে তাঁর রচনার সংখ্যাও প্রচুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভারতী' নামক বিখ্যাত সাময়িক পত্রের তিনি একজন নিয়মিত লেখক হয়ে পড়লেন। এ দেখে সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর অনুরাগ রবীন্দ্রনাথের প্রতি খুব বেড়ে যেতে লাগল। তাঁরা তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতে লাগলেন।

১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে তাঁর মেজ দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে থেকে ইংরেজি সাহিত্য পড়তে গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদের জেলা জজ। এই বছরেরই ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে 'পুণা' নামক জাহাজে বিলাতে রওনা হলেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে কবির এই প্রথম বিদেশ যাত্রা। ইতিপূর্বেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রথম বিদেশ ভ্রমণ

ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন তাঁর বউদিদি সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী এবং তাঁদের পুত্র ও কন্যা সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা। ইন্দিরার সঙ্গে পরবর্তীকালে সুসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ব্রাইটনের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। পরে তারকনাথ পালিত (পরে স্যার) মহাশয় তাঁকে লণ্ডনে নিয়ে এসে 'ইউনিভার্সিটি কলেজে' ভর্তি করিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথকে এই সময়ে হেনরি মর্লের নিকট অধ্যয়ন করতে হয়েছিল। তাঁকে ল্যাটিন শেখাবার জন্যেও শিক্ষক রেখে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি গান তো শিখতেনই। ব্রিটিশ মিউজিয়মে যাবার অভ্যাস

ছিল রবীন্দ্রনাথের। পার্লামেণ্ট সভায় গিয়ে গ্ল্যাডষ্টোন আর ব্রাইটের বক্তৃতাও তিনি শুনেছিলেন।

কিন্তু এই শিক্ষার সময়েও তাঁর রচনার বিরাম ছিল না। 'ভগ্নতরী' কবিতা এই সময়েরই রচনা। ইউরোপ থেকে তিনি সেখানকার আচার-ব্যবহার, দৃশ্য ইত্যাদির যে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা চিঠির আকারে এদেশে প্রেরণ করতেন, তা 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' নামে 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপা হতো। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ আবার তাতে 'ফুটনোট' জুড়ে দিতেন।

১৮৮০ সালে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন কলকাতায়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' আর 'কাল মৃগয়া' নামে সঙ্গীত-নাট্য দু'টি ইতিপূর্বেই রচিত হয়েছিল। এই নাটক দু'টিতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অভিনয় করেছিলেন,—'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় বাল্মীকির ভূমিকায় এবং 'কাল মৃগয়া'তে অন্ধমুনির ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অভিনয় হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। দর্শকের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অনেকেই ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অভিনয় দর্শন করে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের গলার মালা পরিয়ে দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। এখান থেকেই ভবিষ্যৎ বিশ্বকবির খ্যাতির সূত্রপাত।

১৮৮১ সালে মেডিকেল কলেজের 'লেকচার থিয়েটারে' বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে এক বক্তৃতা-সভার আয়োজন হয়। সভাপতি ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। প্রকাশ্য সভায় এইটিই বোধ-হয় তাঁর প্রথম বক্তৃতা।

১৮৮১ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিলাত যাত্রা করেন। সঙ্গী ছিলেন তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী এবং আশুতোষ চৌধুরী (পরে যিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি

হয়েছিলেন)। বিলাতে গিয়ে আইন পড়াই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কি কারণে তাঁর অকস্মাৎ মত পরিবর্তন হলো। মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়েই তিনি ফিরে আসেন। প্রথমে গেলেন মুসৌরীতে পিতার কাছে, তারপর ফিরে এলেন চন্দননগরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে। এই সময়টা কবির খুব আনন্দে কেটেছিল। তখন তিনি অজস্রধারে কবিতা আর গান রচনা করতেন, এবং সেগুলোতে নিজেই মনের আনন্দে সুর সংযোজনা করতেন।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

কিছুকাল পরে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি ১০নং সদর ষ্ট্রীটে বাস করতে থাকেন। এই বাড়িতে থাকবার সময়েই তিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভ করেছিলেন। ঐখানে থাকতেই তাঁর কবি-প্রতিভার উপর যে মোহাবরণ ছিল তা ছিন্ন হয়ে গেল। কবি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি রচনা করলেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবি-প্রতিভার স্বপ্নভঙ্গেরই নামান্তর। ইতিপূর্বে আত্মপ্রকাশের বেদনা কবিকে পীড়িত করছিল। কিন্তু প্রকৃতি-পরিচয় নিবিড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রতিভা-নির্ঝর শতধারায় উৎসারিত হলো—পৃথিবীর সব কিছু কবির কাছে মধুবৎ প্রতিপন্ন হলো। কবি তাঁর নিজের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন—সেই বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তিনি অতঃপর সৌন্দর্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করলেন। এর পর থেকে যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন তা হয়েছে অনবদ্য ও অপরূপ। এই সময় থেকে কবির হৃদয়-দুয়ার অকস্মাৎ বিশ্বের শোভা-সৌন্দর্যের সংস্পর্শে এসে খুলে গিয়েছে। তিনি লিখলেন—

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর

কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান
না জানি কেনরে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ !

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনার পরে কবি কিছুকাল বোম্বাই প্রদেশের কারওয়ার নামক জায়গায় বাস করেছিলেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাটিকা লেখা হলো এখানেই। সঙ্গে সঙ্গে চললো 'ছবি ও গানে'র কবিতা রচনা। তা' ছাড়া সেই সময়কার বাক্‌সর্বস্ব রাজনৈতিক আস্ফালনের বিরুদ্ধেও কবি এই সময়ে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধগুলিতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের উপায় সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

১৮৮৩ সনেরই ডিসেম্বর মাসে কবির সঙ্গে খুলনা জেলা নিবাসী বেণীমাধব চৌধুরীর এগারো বছরের কন্যা ভবতারিণী দেবীর বিবাহ হলো। বিয়ের পর নববধূর সেকেলে নাম পাল্টে নতুন নাম রাখা হলো মৃণালিনী দেবী। অনেকের ধারণা এ নাম রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। পর বৎসর কবির বৌঠাকরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী মারা গেলেন। কবির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সুমিষ্টতা তো ছিলই, তার চেয়েও বেশি ছিল আন্তরিক টান। তা' ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ওপর কবি বিহারীলালের যে প্রভাব এসে পড়েছিল তার মূলে ছিলেন এই কাদম্বরী দেবী। ইনি বিহারী-লালের কবিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। চক্রবর্তী কবি ঠাকুর-বাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে যখন কাব্যালোচনা করতেন সে সময় রবীন্দ্রনাথ নিবিষ্টমনে তা' শুনতেন। চক্রবর্তী কবির সঙ্গে তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের এমনি করেই প্রথম ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। তাই কাদম্বরীর মৃত্যু এদিক থেকেও তাঁর কাছে একটা বিশেষ ঘটনা। কবির জীবনে এই বোধ করি প্রথম বড় শোক। এত বড়ো শোক যে মাত্র দেড় মাস পরে সেজদা হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যুর শোকও পূর্বশোকে

সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গিয়েছিল। 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতা লেখা হয় এই সময়েই। তা' ছাড়া কবি তখন মাঝে মাঝে শেলী, ব্রাউনিং, ভিক্টর হুগো প্রভৃতি ইউরোপীয় কবিদের কাব্য থেকে তর্জমা করেও কাল কাটাতেন।

কবি তখন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারী হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আবার ওদিকে হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার নিয়ে মেতেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর লেখনী-যুদ্ধ শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথ লিখতেন 'ভারতী'তে আর বঙ্কিম 'প্রচার' এবং 'নবজীবনে'।

এই সময়ে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশিত হলো, আর 'শৈশব সঙ্গীত'। দু'খানি বই-ই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৌঠাকরুণকে উৎসর্গ করলেন। কবি বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণে লেখা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। একটা মজার ব্যাপার হলো এই যে, এ বইয়ের নামের মধ্যেই লুকানো রয়েছে লেখকের নাম। ভানু অর্থাৎ রবি, সিংহ অর্থাৎ ইন্দ্র ; কাজেই 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র অর্থ দাঁড়ালো 'রবীন্দ্র ঠাকুরের পদাবলী'।

পরের বছর সত্যেন্দ্রনাথের পত্নীর সম্পাদনায় 'বালক' নামক মাসিকপত্র প্রকাশিত হলো। পত্রিকাটির উন্নতির জন্যে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের অন্ত ছিল না। এক বছরেই তিনি 'বালকে' লিখলেন ১২টি কবিতা, ২০টি প্রবন্ধ, ১৭টি বিবিধ রচনা, 'মুকুট' নামে একটি নাতিদীর্ঘ গল্প আর 'রাজর্ষি' উপন্যাস। এসময়ে তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর একটি সংকলন গ্রন্থও প্রকাশ করেন। 'রবিচ্ছায়া' নাম দিয়ে তাঁর নিজের গানগুলির একটি সংকলন গ্রন্থ তাঁর এক বন্ধুর উদ্যোগে প্রকাশিত হলো। 'আলোচনা' নামে বিবিধ প্রবন্ধের একটি বইও এই সময়েই প্রকাশিত হয়।

১৮৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান মাধুরীলতা বা বেলার জন্ম হয়। এই বছরেই হয় কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয়

অধিবেশন। সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নৌরজী। রবীন্দ্রনাথ সভাতে তাঁর স্বরচিত গান 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' উদ্বোধন সংগীত হিসাবে গান করেন।

১৮৮৮ সালে কবি 'মায়ার খেলা' নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর উদ্যোগে স্থাপিত 'সখী সমিতি'তে নাটকটি অভিনীত হয়। 'মায়ার খেলা' সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, "এ রকম অপেরা আর হয়নি। 'মায়ার খেলা'য় কবি প্রথম সুরকে পেলেন, কথাকেও পেলেন। বোধ হয় বাড়ির কোনো মেয়ের বিয়ের সময় ওটি রচিত হয়, কিন্তু ওতে তাঁর নিজের কথার সঙ্গে সুরের পরিণয় অদ্ভুত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওখানে একেবারে ওঁর নিজস্ব সুর। অপেরাজগতে ওটি একটি অমূল্য জিনিষ।" এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে গাজিপুরে বেড়াতে গেলেন। 'মানসী'র বিখ্যাত কবিতাগুলির অধিকাংশই এ সময়কার রচনা। নভেম্বর মাসে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান এবং জ্যেষ্ঠ ও একমাত্র জীবিত পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

পরের বছর রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল বোম্বাই প্রদেশের খিড়কিতে সপরিবারে বাস করেছিলেন। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি তাঁর নূতন নাটক 'রাজা ও রাণী'তে রাজা বিক্রমের ভূমিকা অভিনয় করেন। নাটকটি বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। সাজাদপুরে তিনি 'রাজর্ষি' উপন্যাসখানিকে 'বিসর্জন' নাটকে রূপান্তরিত করলেন, এবং জোড়াসাঁকোতে নাটকটির অভিনয়ে স্বয়ং রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ আবার বিলাত যাত্রা করলেন। সঙ্গী ছিলেন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ এবং বন্ধু লোকেন পালিত। দেখলেন ইতালী, বেড়ালেন ফ্রান্সে, গেলেন ইংলণ্ডে। কিন্তু বিলাতে তাঁর মন টিকলো না। ফিরে এলেন দেশে। এই সময় কবি রোজ ডায়েরী লিখতেন। এগুলো পরে (১৮৯১ খ্রীঃ) প্রকাশিত

হয়েছে 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' নামে। তাঁর এ প্রবাস-স্মৃতিতে দৃশ্য বস্তুর তেমন প্রাধান্য নেই। অথচ যে বয়সে তিনি প্রথম দু'বার বিদেশে ভ্রমণ করে এলেন, নতুন দৃশ্য, নতুন জগৎ তরুণ মনের ওপর সে সময়টাতেই সাধারণত গভীরভাবে রেখাপাত করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটেছে, ইউরোপের মায়া ও সাজ তাঁকে মোহগ্রস্ত করতে পারেনি। এর কারণ বোধ হয় তাঁর বাল্যস্মৃতি, ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়া।

দেশে ফিরে এলে কবির ওপর জমিদারী পরিচালনার গুরুভার অর্পিত হলো। শিলাইদহে, পতিসরে, পদ্মার বুকে, ঘাটে ঘাটে বোটে করে কবি বেড়াতে লাগলেন। জনসাধারণের কাছাকাছি এসে তাঁর প্রতিভার একটা দিক যেন খুলে গেল। পল্লী-জীবনের বৈচিত্র্য তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেন, আর তার ছাপ তুলে নিলেন মনের ক্যামেরায়। অজস্র ছোটগল্প লেখা হতে লাগলো,— পোস্টমাস্টার, গিন্নী, দেনাপাওনা ইত্যাদি। কবির বহু ছোটগল্পে ও কবিতায় এই সময়কার অভিজ্ঞতার কথা আছে, আর আছে কবির স্বচক্ষে দেখা পল্লী-প্রকৃতির রূপটি। এই সময়ে প্রতি সপ্তাহে 'হিতবাদী' পত্রিকায় একটি করে গল্প থাকতো রবীন্দ্রনাথের। প্রত্যেকটিই নতুন, প্রত্যেকটিই বিস্ময়কর। 'সাধনা' নামক মাসিকপত্রিকা যখন প্রকাশিত হলো সেখানেও তাঁর দানের বিরাম ছিল না; বহু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ দিয়ে তিনি পত্রিকাটির গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

জমিদারী পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ সহৃদয় পাকা জমিদারেরই পরিচয় দিয়েছেন; তার যথেষ্ট প্রমাণও রয়েছে। প্রজারা যে তাঁকে ভালোবাসত ও অশেষ শ্রদ্ধা করত তা সে সময়কার যে সব প্রজা এখনো বেঁচে আছে তাদের মুখেই শোনা যায়। তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের সময় প্রজারা তাঁকে নানা রকমের উপঢৌকন দিয়েছিল, তিনি প্রথমে গ্রহণও করেছিলেন সেগুলো। কিন্তু হঠাৎ কী মনে

হলো, প্রজাদের ডেকে ফিরিয়ে দিলেন সব জিনিষ। শুধু তাই নয়, উল্টো তাদের কিছু কিছু দান করলেন! প্রজারা সব অবাক! তারা কী করবে ঠিক করতে পারল না। তখন তিনি বললেন, "কী লজ্জা! আমার পিতার শ্রাদ্ধ। আমি নেব তোদের উপহার!" মৃত্যুর কয়েক বছর আগে আত্রাইতে তিনি তাঁর প্রজাদের খোঁজ-খবর নিতে গেলেন। প্রজারা তাঁকে দেখতে এসে বলে গেল, "পয়গম্বরকে আমরা চোখে দেখিনি, আপনাকে দেখছি।" আত্রাইয়ের প্রজারা অধিকাংশই মুসলমান। দরদী হিন্দু জমিদার রবীন্দ্রনাথের ওপর তাদের শ্রদ্ধা কিরূপ অপরিসীম ছিল তাদের এ কথাই তার সাক্ষ্য।

১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল কটকে ছিলেন। এখানেই তাঁর বিখ্যাত নাটক 'চিত্রাঙ্গদা' রচিত হয়। চিত্রাঙ্গদা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা, এবং কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। পুস্তকটির ছবিগুলি আঁকা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, এবং তাঁকেই কবি বইটি উৎসর্গ করলেন। এই সময়ে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর বিরাগ ধ্বনিত হয়েছিল 'শিক্ষার হের ফের' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে কবি প্রথম মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সোনার তরী'র অধিকাংশ কবিতাই এই সময়ের রচনা।

এবার ফিরাও মোরে

পরের বছর চৈতন্য লাইব্রেরীর এক সভায় রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রবন্ধটি পরে 'সাধনা'তে প্রকাশিত হয়। 'সাধনা'র যুগ কবির জীবনে তীব্র স্বদেশপ্রেমের যুগ। ১৮৯৪ সালে কবি 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি লিখলেন। ইতিপূর্বেই 'উর্বশী'

প্রমুখ 'চিত্রা'র শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো লেখা হয়েছিল। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে কবি আরামের জীবন, স্বপ্নের জীবন থেকে, বংশীধ্বনি ছেড়ে বাস্তব জীবনের রণক্ষেত্রে সারথ্য গ্রহণে এগিয়ে এলেন—

> এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
> হে কল্পনে রঙ্গময়ি! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
> তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়,
> বিজন-বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায়
> রেখো না বসায়ে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর কলকাতায় যে শোকসভা হয়, রবীন্দ্রনাথ তাতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বঙ্কিমের প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথ কতখানি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তা এই প্রবন্ধে সুপ্রকাশিত। এর পরে তিনি স্বয়ং 'সাধনা'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন, এবং সমসাময়িক বহু অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার মধ্য দিয়ে। 'মেঘ ও রৌদ্র' নামক গল্পে রাজকীয় অনাচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ সমালোচনা অমর হয়ে আছে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নামে একটি প্রহসন লিখে কবি স্বয়ং কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিছু দিন নাটোরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে'র অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথ সভাতে যোগদান করে সভার কার্যসূচী যাতে বাংলাতে পরিচালিত হয় তার জন্যে আন্দোলন শুরু করলেন। কিন্তু এই আত্মবিস্মৃত জাতির দেশে তাতে কোন ফল হয়নি। বরং কবিকে তাঁর এই মাতৃভাষা-প্রীতির জন্যে অনেক বেদনাদায়ক বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। সেই বেদনারই প্রতিধ্বনি করে বেশ কয়েক বৎসর পরে তিনি এক গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"সাধনা পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম

আলোচনা করি। তাতে আমি এই কথাটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি। তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্ণমেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতাম। আমাদের দেশে পোলিটিক্যাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমতো কল্পনা করতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনীকে, গ্রাম্যজনমণ্ডলী সভাতে, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংযত বলে মনে করতেই পারতেন না। রাজসাহী সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্র-নেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন। বিদ্রূপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কার্যেই আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি, এ ক্ষেত্রেও তাঁর অন্যথা হয়নি। পর বৎসর রুগ্ন শরীর নিয়ে ঢাকা কনফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষ্যে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্যোগ করেছি। বাঙালীর ছেলের পক্ষে যে গালি সবচেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে। এতবড় দুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করেছিলাম তার একটা কারণ, ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বাল্যকাল থেকে আমি সত্যই অবহেলা করেছি, দ্বিতীয় কারণ, পিতৃদেবের সামনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারের পরস্পর পত্রলেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার অপমানজনক

বলে গণ্য হত।" সেদিন রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ে এমনি গ্লানি সহ্য করতে হলেও যেখানে জাতির কল্যাণের প্রশ্ন, জাতীয় স্বার্থের ও মান-অপমানের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেখানেই কবিকণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে—রাজনীতি থেকে রবীন্দ্রনাথ তখন নিজেকে দূরে রাখতে পারেন নি।

নাটোর অধিবেশনের পরের দুই বছরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাহিনী'র অধিকাংশ কবিতা রচনা করলেন। আর সেই সঙ্গে চলেছিল সরকারী অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ১৮৯৮ সালে টাউন হলের এক সভায় তিনি 'কণ্ঠরোধ' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন।

১৮৯৯ সালে কলকাতায় যখন প্লেগের খুব প্রকোপ, রবীন্দ্রনাথ তখন নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে কবি তখন অক্লান্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মহানগরীর দ্বারে দ্বারে, সেবাকার্যে সহায়তা করবার জন্যে। কবি রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সেবক রূপ দেশ সেদিন প্রত্যক্ষ করেছে।

১৯০০ সালে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' প্রকাশিত হয়। 'কণিকা'র কবিতাগুলো ছোট ছোট মুক্তাবিন্দুর মতো উজ্জ্বল—সেগুলোর ভাব-গভীরতাও লক্ষ্যণীয়। এর পর 'ক্ষণিকা' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। "ক্ষণিকা' হালকা অথচ সুন্দর কবিতার সমষ্টি, যার জুড়ী, অনেকেই বলেছেন, যে-কোনও সাহিত্যেই খুঁজে পাওয়া ভার। এই সময় কবি 'ভারতী'র জন্যে তাঁর বিখ্যাত প্রহসন 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' রচনা করেন। পরে এই প্রহসনের নাম দেওয়া হয় 'চিরকুমার সভা'। এই বছরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার সঙ্গে কবি বিহারীলালের পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর বিবাহ দেন।

১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে কবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'কে পুনরুজ্জীবিত করলেন। পর পর প্রায় পাঁচ বছর কবি 'বঙ্গদর্শনে'র

সম্পাদনা করেছেন, এবং 'বঙ্গদর্শনে'র জন্যেই রবীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে লিখেছেন 'চোখের বালি', লিখেছেন 'নৈবেদ্য'। 'চোখের বালিতে'ই মনোবিশ্লেষণমূলক উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাব, একথা কবি স্বয়ং বলেছেন। ইতিপূর্বে যা ছিল তা রোমান্স জাতীয় অর্থাৎ খাঁটি জীবনের গল্প তাতে ছিল না। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক রীতির প্রবর্তন করলেন। এইদিক থেকে 'চোখের বালি'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক উপন্যাস এবং এ সময় থেকেই অর্থাৎ ১৩০৮ সাল থেকে রচিত উপন্যাসরাজির মধ্যেই সমাজ-মানস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চেতনার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। আর 'নৈবেদ্য' সম্পর্কে শোনা যায়, একদিন তিনি মহর্ষির কাছে বসে কবিতাগুলো পাঠ করে যান। পাঠ শেষ হলো; অভিভূত মহর্ষি এক থলি টাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করলেন। সেই টাকাতেই 'নৈবেদ্য' ছাপা হয়। ১৯০১ সালেই রবীন্দ্রনাথ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সংস্পর্শে আসেন। ইনি শান্তিনিকেতন স্থাপনে ও শান্তিনিকেতনের শিক্ষাকার্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সহায়তা করেছিলেন।

এই বছরের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক দারুণ পরিবর্তন এলো। তিনি ছাড়লেন জমিদারী পরিচালনার ভার, তাঁর পদ্মাতীরের প্রিয় ভূমি। চলে এলেন সুদূর বীরভূমের ঊষর রুক্ষ প্রান্ত প্রদেশে। ২২শে ডিসেম্বর তারিখে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হলো।

এই আশ্রমের আদর্শ যে পরিপূর্ণভাবে ভারতীয়, সে কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। ছাত্র আর গুরুর মধ্যে কোন শাসনের প্রাচীর থাকবে না, খেলায় ধূলায়, মেলায় মেশায় পরস্পরের মধ্যেকার বয়সের ব্যবধান, অপরিচয়ের দুস্তর সমুদ্র তুচ্ছ হয়ে যাবে, এই হলো তাঁর মূলমন্ত্র। কবির সঙ্গে যোগ দিলেন জগদানন্দ রায়, উইলিয়ম লরেন্স, রেওয়া চাঁদ ইত্যাদি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধ্যায়

ব্রহ্মবান্ধব আর কবি সতীশ রায়ও কিছুদিন পরেই কবির সহায়তায় এগিয়ে এলেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তো হলো। কিন্তু আর্থিক সমস্যা ঘোচে কই? জমিদারীর যা আয়, তার অধিকাংশই যায় পাটের ব্যবসার (বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন) ধার শোধ করতে। বিদ্যালয় চালাবার খরচ জোটে না। বিদ্যালয় চালাতে গিয়ে পুরীর সমুদ্রতীরের নতুন বাড়িখানি গেল বিকিয়ে। কবি-পত্নী আপনার গহনা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে আশীর্বাদ জানালেন।

বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো 'বঙ্গদর্শন' তো ছিলই। ১৯০২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বক্তৃতায় লর্ড কার্জন দেশবাসীকে 'অত্যুক্তি'-প্রিয় বলে তিরস্কার করলেন। রবীন্দ্রনাথ দিলেন তার কড়া উত্তর 'বঙ্গদর্শনে'র 'অত্যুক্তি' নামক প্রবন্ধে। হারবার্ট স্পেন্সারের 'ফ্যাক্টস অ্যাণ্ড কমেন্টস' তো হাতের কাছেই ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বইটির যেখান থেকে সেখান থেকে লাইনের পর লাইন উদ্ধৃত করে প্রমাণ করলেন যে, মিথ্যা প্রচারকার্যে ইংরেজ জাতির জুড়ী নেই।

এই বছরের শেষভাগে কবি-পত্নী গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁকে কলকাতায় আনা হলো। ২৩শে নভেম্বর তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। শিশু পুত্র-কন্যাদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর বেদনা তাঁর 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হয়েছে।

শোকের পরে শোক, আঘাতের পর আঘাত। অল্পদিন পরেই তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো আলমোড়াতে। এখানে শিশুপুত্র শমীন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে কবি যে-সব কবিতা রচনা করেছিলেন, তা 'শিশু' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কিছু কালের জন্যে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু জরুরী তার পেয়ে তাঁকে ফের আলমোড়ায় ফিরে যেতে হলো। গাড়ি নেই,—কাঠগুদাম থেকে সমস্ত রাস্তা যেতে হলো পদব্রজে। রেণুকাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনলেন বটে, কিন্তু তার জীবনাবসান ঘটলো সেই মাসেই। ঠিক ছ'মাস আগেই তাঁর পত্নী মারা গিয়েছিলেন।

এই উপর্যুপরি শোকের মধ্যেও তাঁর রচনার বিরাম ছিল না। সম্পাদকদের তাড়ারও শেষ ছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, অন্তরে প্রেরণা না থাকা সত্ত্বেও 'বঙ্গদর্শনে'র জন্যে 'নৌকাডুবি' নামে বিরাট একটি উপন্যাস ফাঁদতে হলো।

১৯০৪ সালে কবি সতীশ রায় শান্তিনিকেতনে বসন্তরোগে মারা গেলেন। ইস্কুল সাময়িকভাবে উঠে গেল শিলাইদহে। এই সময়ে রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহে কবির জীবন ক্রমশই জড়িয়ে পড়ছিলো। একদিকে ইংরেজের ক্রমবর্ধমান অন্যায় ও অবিচার, অন্যদিকে দেশের জনসাধারণের নবজাগ্রত চেতনাবোধ, এর মধ্যে কবি শেষেরটিকেই বেছে নিয়েছিলেন বলে বোধ হয়। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ রচিত হতে লাগল ; প্রকাশিত হলো 'রাজ-কুটুম্ব', 'ঘুষোঘুষি', 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত'। মিনার্ভা থিয়েটারে জুলাই মাসে কবি পড়লেন 'স্বদেশী সমাজ'। সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। কি-করে দেশের উন্নতি সম্ভব, কবি তার একটি পরিকল্পনা জানালেন। তাতে স্বাবলম্বনের কথা আছে, কুটীরশিল্পকে অবলম্বন করার কথা আছে এবং সমাজ-তত্ত্বের অনেক নতুন আদর্শের বর্ণনা আছে।

কলকাতায় মারাঠা ছত্রপতি শিবাজীর স্মৃতিরক্ষার্থ উৎসবের আয়োজন হলো। রবীন্দ্রনাথ উৎসাহী হয়ে উঠলেন। 'শিবাজী উৎসব' নামে বিখ্যাত কবিতাটি রচিত হলো সেই উপলক্ষ্যে। টাউন হলের জনসভায় কবি উদাত্তকণ্ঠে সেটি সকলকে পড়ে শোনালেন। বললেন—

হে রাজা শিবাজী,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি,—
এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।

কবি শোনালেন—খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্যপাশে বেঁধে রাখতে হলে শিবাজীর পুণ্যনাম স্মরণ করা কর্তব্য সর্বাগ্রে। শিবাজীই ভারতীয় জাতীয়তা ও স্বাধীনতার অগ্রদূত।

১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটলো। কিছুকাল পরে কবি 'ভাণ্ডার' নামক একটি নতুন মাসিকপত্রের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন। কয়েক মাস বাদে আগড়তলায় একটি সাহিত্য সম্মেলনে 'দেশীয় রাজ্য' নামে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ইতিমধ্যে লর্ড কার্জন দেশবাসীর প্রাণে শক্তিশেল হানলেন বঙ্গ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করে। সমস্ত দেশময় অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়লো বিদ্যুৎ-প্রবাহের মতো। এই ঘটনাতেও কবি রবীন্দ্রনাথ জনমণ্ডলীর পুরোভাগে এগিয়ে এলেন। পঁচিশে আগস্ট টাউনহলের সভায় 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামে প্রবন্ধ পড়লেন। সাব্যস্ত হলো, অতঃপর বিলাতী মাল বয়কট করা হবে। স্বদেশী গানের স্রোত তাঁর লেখনীমুখে প্রবাহিত হলো। দেশসেবার মন্ত্রে কবি দেশবাসীকে দীক্ষিত করলেন।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ-বিচ্ছেদের দিন বলে নির্দিষ্ট হলো। কবি সেদিন প্রত্যূষে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি গাইতে গাইতে বিরাট একটি মিছিলের নেতৃত্ব করলেন। মিছিলের জনসাধারণ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে স্নান করে পরস্পরের হাতে প্রীতির বন্ধনসূত্রে 'রাখী' বেঁধে দিল। মন্ত্র হলো 'ভাই ভাই, এক ঠাঁই।' আবার বিকালে দেশপ্রেমিক আনন্দমোহন বসু প্রস্তাবিত

'ফেডারেশন হলে'র ভিত্তি স্থাপন করলেন। সভাপতির অভিভাষণটি বাংলা করে শোনালেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর রবীন্দ্রনাথের রচিত 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে' এবং 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান'—এই দুইটি গান গাইতে গাইতে বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়িতে বিরাট একটি শোভাযাত্রা উপস্থিত হলো। এখানে রবীন্দ্রনাথ ওজস্বিনী ভাষায় জনসাধারণকে উদ্দেশ করে একটি বক্তৃতা দিলেন। 'জাতীয় ফণ্ডে'র জন্যে সাহায্য চাওয়া হলো,—উঠলো পঞ্চাশ হাজার টাকা।

বাংলা সরকার সার্কুলার জারী করলেন, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি অবৈধ। কবির তখন কী ক্ষোভ! পার্কে পার্কে, হলে হলে, প্রাসাদে প্রাঙ্গণে তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন, জনসাধারণের প্রাণে আগুন জ্বালালেন। অসংখ্য গান তিনি এই সময়ে রচনা করেন, তার প্রত্যেকটিতে কবির গভীর স্বদেশপ্রেম অভিব্যক্ত হয়েছিল। তাঁর স্বদেশী গানগুলি পরে 'বাউল' নামে একটি গ্রন্থে সংকলিত করা হয়।

দেশময় সে এক মহা অশান্তির যুগ। সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ স্থাপন করা হলো। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ।

পরের বছর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকা পাঠালেন কৃষিবিদ্যা শেখবার জন্যে। এই বছর বরিশালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আহূত হলো, সভাপতি নির্বাচিত হলেন রবীন্দ্রনাথ। সে সময় বরিশালে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন হবারও কথা ছিল। কিন্তু পুলিশী জুলুমে উভয় অধিবেশনই পণ্ড হলো। সে কাহিনী যেমন মর্মান্তিক তেমনি নৈরাশ্যের। ভগ্নহৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ বরিশাল থেকে ফিরে এলেন।

এই বছরই রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনা ছেড়ে দিলেন। 'ভাণ্ডার' অবশ্য তখনো বন্ধ হয়নি। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের

স্থাপনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছু সময় মেতে রইলেন। 'শিক্ষাসমস্যা,' 'ততঃ কিম্' প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করলেন, বিভিন্ন স্থানে সেগুলি পড়লেনও। পরের বছর কাশিমবাজারে মণীন্দ্র নন্দী মহাশয়ের আহ্বানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মুলতবী অধিবেশন বসলো। রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করলেন।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনে আর একটি অজ্ঞাত প্রভাব কাজ করছিল। দেশের তৎকালীন আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর অন্তরের সায় ছিল না, একথা তিনি ক্রমশই উপলব্ধি করছিলেন। তিনি দেখলেন, আন্দোলনকারীরা তুচ্ছ দলাদলি নিয়েই মত্ত, দেশের বৃহৎ আদর্শের কথা গিয়েছে ভুলে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ক্রমশই গুরুতর আকার ধারণ করছে। এই স্বার্থের রেষারেষি ও ক্ষুদ্র ভেদবুদ্ধির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত হাঁপিয়ে উঠলো। তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন।

পরের মাসের 'প্রবাসী'তে 'ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' নামে প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য জানালেন। দেশময় বিদ্রূপ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো। তাঁর এককালের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'প্রবাসী'র প্রবন্ধের উত্তর দিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে ফিরে এলেন না।

রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে যেটা ক্ষতি, সাহিত্যের পক্ষে সেটাই হলো পরম লাভ। এই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি কেবলমাত্র 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বইটি উৎসর্গ করেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে। স্বদেশী আন্দোলনের বন্ধন ছিন্ন করে এবার রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দিলেন। তাঁর কাব্য-বীণায় শত শত সুরের ঝঙ্কার বেজে উঠলো। তাঁর সাহিত্য-সাধনায় উৎসৃষ্ট জীবনের এটাই সম্ভবত সবচেয়ে গৌরবের যুগ। এই যুগে পৃথিবী তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে অপরিমিত সম্পদ—'গোরা' উপন্যাস। তা ছাড়া তাঁর

বিখ্যাত কবিতা 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' এই সময়ে লেখা। অরবিন্দ তখন 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার দায়ে বিচারাধীন। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দকে 'বন্ধু' বলে সংবর্ধনা জানালেন, বললেন—

> অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
> হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
> বাণী-মূর্তি তুমি!

এই বছর রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। মুঙ্গেরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ কলেরা রোগে মারা যান।

১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে পাবনাতে যে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়, রবীন্দ্রনাথ তাতে সভাপতিত্ব করেন। তখন দেশময় বিরাট উত্তেজনা। ইতিপূর্বে সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থীরা বহিষ্কৃত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংযত অথচ উদ্দীপনাময়ী অভিভাষণে দেশের তরুণদের তাঁর আবেদন জানালেন; তাদের বললেন সংঘবদ্ধ হয়ে গ্রামে গ্রামে সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় করে তুলতে, পল্লীগ্রামে গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে।

মে মাসের গোড়াতে দেশে এক উত্তেজনাকর ব্যাপার ঘটলো। মাণিকতলাতে এক গুপ্ত বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হলো, বারীন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অনেক যুবক তাতে গ্রেফতার হলেন। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরীর এক সভায় 'পথ ও পাথেয়' নামে প্রবন্ধ পড়লেন। ধৃত যুবকদের অতুলনীয় স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা করে বললেন, ইংরেজের নির্দয় দমন-নীতিই এর জন্যে দায়ী। অবশ্য দেশপ্রীতির অজুহাতেও এ ধরণের সন্ত্রাসবাদ অবাঞ্ছনীয়, তবু এই নির্ভীক যুবকদের জীবন-পণ-করা খেলা যে বাঙালীর ললাট থেকে

ভীরুতার কলঙ্ক মুছে দিল, একথা রবীন্দ্রনাথ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন।

১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতনে তাঁর অতুলনীয় নাটক 'শারদোৎসব' অভিনীত হলো। 'বঙ্গবাসী' অফিস থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে একটি প্রবন্ধে কবি আত্মপরিচয় বিবৃত করলেন। এই প্রবন্ধটিই 'জীবনস্মৃতি'র অগ্রদূত। ওদিকে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ শুরু করেছেন,—বলছেন, রবীন্দ্রনাথ দুর্বোধ্য, রবীন্দ্রনাথের কাব্য নীতিবর্জিত। কবি প্রথমে এই অভিযোগে কর্ণপাত করেন নি, কিন্তু পরে এক বন্ধুর কথায় একটি প্রবন্ধ লিখে তাঁর মতামত জানালেন।

এই প্রবন্ধেই কবি তাঁর কাব্য-বিবর্তনের মর্মোদ্ঘাটন এবং তাঁর 'জীবন-দেবতা' রহস্যের ওপর প্রথম আলোকপাত করলেন। তিনি জানালেন—"...রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচয়িতা আছেন।...এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবন-দেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন;—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।"

সাহিত্য সাধনার ধারা কিন্তু অব্যাহতই চলছিল। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক লিখে কবি তাঁর ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে 'সত্যাগ্রহে'র আদর্শকে পরিস্ফুট করে তুললেন। শিলাইদহে বসে রচনা করলেন 'গীতাঞ্জলি'র অননুকরণীয় ভাবসমৃদ্ধ গানগুলি।

নভেম্বর মাসে রথীন্দ্রনাথ তিন বছর পরে আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে ঘুরলেন বোটে বোটে, উত্তরবঙ্গ জুড়ে ছড়ানো তাঁর জমিদারীতে। উদ্দেশ্য, ছেলেকে দেশের পল্লী-জীবনের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবেন। কিছুকাল পরে প্রতিমা দেবীর সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দিলেন। ১৯১০ সালে তাঁর 'রাজা' নামে রূপক নাটক প্রকাশিত হলো। এ বছরই ত্রিশ বৎসর বয়স্ক জার্মাণ দার্শনিক কাউন্ট কাইজারলিং ভারত ভ্রমণে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনায় মুগ্ধ হন এবং স্বরচিত ভ্রমণ কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখেন, "Rabindranath, the poet impressed me like a guest from higher, more spiritual world. Never, perhaps, have I seen so much spiritualised substance of soul condensed into one man." পরের বছর মে মাসে লোকেন পালিত মহাশয় তাঁর একটি গল্পের তর্জমা প্রকাশ করলেন 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকাতে। এই মাসেই শান্তিনিকেতনে কবির পঞ্চাশৎতম জন্মোৎসব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো।

'প্রবাসী'তে তখন 'জীবনস্মৃতি' লেখা নিয়মিতভাবে চলছে। অবসর সময়ে 'ছিন্নপত্র' লিখছেন, এবং 'ডাকঘর' নামক নাটিকা। ইতস্তত দু'একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৯১২ সালে জানুয়ারী মাসে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র উদ্যোগে তাঁকে পঞ্চাশ বছর পূরণ উপলক্ষ্যে সম্মানিত করা হলো। টাউন হলে বিরাট জনসভায় দেশ তার জাতীয় কবিকে অভিনন্দিত করলে। 'জনগণমন অধিনায়ক' সঙ্গীতটি রচিত হলো, এবং কবি ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে স্বয়ং গানটি প্রথম গাইলেন।

১৯১১ সালে 'অচলায়তন' নাটকটি লেখা হলো ; বিদ্রূপবাণে কবি জর্জরিত করলেন অন্ধ গোঁড়ামিকে। গোঁড়ারা আহত হয়ে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিলেন। কবির ভ্রূক্ষেপ নেই।

তিনি লিখছেন 'ডাকঘর', লিখছেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'।

এই সময়ে তাঁর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থতার মধ্যেও কবি তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি তর্জমা করলেন। এখানে বলে রাখা দরকার, 'গীতাঞ্জলি'র বাংলা আর ইংরেজি সংস্করণ হুবহু এক বই নয়। ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'তে তাঁর লেখা 'শিশু', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য', প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ থেকেও কয়েকটি কবিতা নেওয়া হয়েছে।

বিদেশে 'গীতাঞ্জলি'

১৯১২ সালের মে মাসে কবি তৃতীয়বার ইউরোপ যাত্রা করলেন, সঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। ইতিপূর্বেও কবি ইউরোপে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর এবারকার উদ্দেশ্য হলো স্বতন্ত্র। এবার তিনি প্রতীচীর দ্বারে প্রাচ্যের বাণী পোঁছে দেবেন এই সংকল্প নিয়ে গেলেন। লণ্ডনে শিল্পী রোদেনস্টাইনের সঙ্গে কবি দেখা করলেন এবং একদিন কথায় কথায় তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি তর্জমাগুলো তাঁকে দেখালেন। তর্জমাগুলো দেখে রোদেনস্টাইন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর বাড়িতে এক সাহিত্যসভার আয়োজন করা হলো। এজরা পাউণ্ড, অ্যালিস মেনেল, আরনেস্ট রাইস, চার্লস ট্রেভেলিয়ন প্রভৃতি উপস্থিত হলেন, এবং সর্বসমক্ষে কবি ইয়েটস 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি থেকে কবিতা পড়ে শোনালেন। সমস্ত ইংলণ্ডে একটা মুগ্ধ বিস্ময়ের স্রোত বয়ে গেল। ইয়েটস সেই পাণ্ডুলিপি পকেটে নিয়ে বেড়াতে লাগলেন, ট্রেনে, টিউবে, সর্বত্র। তিনি যে কতদূর অভিভূত হয়েছিলেন, তা 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি তর্জমার যে ভূমিকা তিনি লিখে দিয়েছেন, তাতেই বোধগম্য হবে। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি ইংরেজি

'গীতাঞ্জলি'র একটি সংস্করণ প্রকাশ করলেন। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বইটি বিশ্বসাহিত্যে সেরা আসন পেল। ইংলণ্ডের সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা, সর্বত্র তাঁর জয়জয়কার। বিভিন্ন সংবর্ধনার উত্তরে কবি যে সমস্ত বাণী দিলেন তার সারমর্ম এই—প্রাচ্য প্রাচ্যই, পশ্চিমও তাই, কিন্তু তথাপি এ দুয়ের মিলন সম্ভব। বিখ্যাত সমালোচক স্টপফোর্ড ব্রূক কবিকে আমন্ত্রণ জানালেন।

এই অজস্র সংবর্ধনা ও অভিনন্দনের মধ্যেও কবি তাঁর প্রিয় শান্তিনিকেতনের কথা ভোলেন নি। করতালির অরণ্যের নীচে তাঁর মন পড়ে রয়েছে ভারতের মাঠে মাঠে, উপায়হীন নিরন্ন জনসাধারণের কুটীরে। বিলাতে থেকেই তিনি কর্ণেল এন. পি. সিংহের নিকট হতে সুরুলের কুঠি কিনলেন। উদ্দেশ্য সেটাকে একটি কৃষিকেন্দ্রে পরিণত করবেন এবং রথীন্দ্রনাথকে দেবেন তার পরিচালনার ভার। এই 'সুরুলের কুঠি'কে ঘিরেই আজকের 'শ্রীনিকেতন' গড়ে উঠেছে।

ইংলণ্ড থেকে কবি গেলেন আমেরিকায়। ইলিওনয়েস, শিকাগো, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিলেন। ভারতীয় সভ্যতার মূলকথা, ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম আর উপনিষদের উদাত্ত বাণী শোনালেন বস্তুতান্ত্রিক আমেরিকাকে। আমেরিকায় প্রদত্ত তাঁর কোন একটি বক্তৃতার পদ্ধতি সম্পর্কে ডাঃ লুইস বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনে তাঁর বোধ হচ্ছিল যেন স্বয়ং এমার্সন কথা বলছেন। এমনি শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেখানে।

আমেরিকা থেকে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। ইংলণ্ডে তখন রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' সকলেরই হাতে হাতে। ইংলণ্ডেও কবি বাণী প্রচার করলেন। এই সব বক্তৃতা পরে 'সাধনা' নামক ইংরেজি প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত

হয়েছে। ইতিমধ্যে এদেশে পিয়ার্সন এবং এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনের কাজে লেগে গেছেন।

১৯১৬ সালের জুন মাসে চিকিৎসার জন্যে তিনি বিলাতে একটি নার্সিং হোমে প্রায় একমাস কাল শয্যাশায়ী থাকেন। তারপর সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে যাত্রা করেন। সমুদ্রপথেই 'গীতিমাল্য'র অনেকগুলি অপূর্ব সংগীত রচিত হলো। ইতিপূর্বেই ম্যাকমিলান কোম্পানী তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করেছিলেন।

বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে তর্জমা হয়ে 'গার্ডেনার', 'ক্রেসেণ্ট মুন', 'ফ্রুট গ্যাদারিং' প্রভৃতি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হলো। 'চিত্রাঙ্গদা'র ইংরেজি অনুবাদ বের হলো 'চিত্রা' নামে। 'রাজা'র ইংরেজি নাম দেওয়া হলো 'দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার'। 'ফাল্গুনী' আর 'বিসর্জন' নাটক দু'খানিও যথাক্রমে 'সাইকল অব স্প্রিং' ও 'স্যাক্রিফাইস' নামে প্রকাশিত হলো। 'রাজা' আর 'ডাকঘর' নাটক দু'খানি ইউরোপের বহু স্থানে অভিনীত হয়েছে।

দেশে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বাস করছিলেন। ১৫ই নভেম্বর তিনি অভ্যাস মতো শাল অরণ্যে বেড়াতে যাবেন, এমন সময়ে সংবাদ এলো—রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল' পুরস্কার পেয়েছেন।

বিদেশে সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতবাসীর এই প্রথম সম্মানলাভ। একখানি স্পেশাল ট্রেনে ৫০০ নরনারী রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানাতে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলেন। এঁদের মধ্যে আশুতোষ চৌধুরী, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তরে জানালেন, দেশের এই আনন্দ-জ্ঞাপন তিনি হৃষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর সাহিত্য-জীবনে চিরদিন দেশের কাছে তাঁর জুটেছে বিরূপতা আর বিদ্রূপ। আজ পাশ্চাত্য জগৎ তাঁকে বরণ করেছে বলেই দেশবাসীও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্বীকার করে নিলেন। তাই যে সম্মানের পেয়ালা তাঁরা

এনেছেন, কবি তা ওষ্ঠপ্রান্তে তুলে ধরছেন, কিন্তু তা থেকে পান করা তাঁর সাধ্যাতীত।

১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলা দেশের গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজের অর্থ আর মেডেল প্রথাসম্মত ভাবে অর্পণ করলেন। ইতিপূর্বেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে 'ডি. লিট' উপাধি দান করে ধন্য হয়েছিল।

এই বছরই 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হলো। সম্পাদনা করতেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। 'সবুজপত্র' বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগ এনেছিল। তথাকথিত 'কথ্য' রীতির প্রবর্তনা 'সবুজপত্রে'ই। রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত ভাবে 'সবুজপত্রে' লেখা শুরু করলেন।

গ্রীষ্মকালটা রামগড় পাহাড়ে কাটিয়ে প্রত্যাবর্তনের পথে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন স্থান ঘুরে এলেন। এই সময়ে এলাহাবাদে তাঁর 'শাহজাহান' নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচিত হয়েছিল।

১৯১৫ সালে গান্ধীজি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে ভ্রমণে আসেন। কিন্তু কবি তখন বাইরে থাকায় গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। মার্চ মাসে মহাত্মা গান্ধী পুনরায় যখন শান্তিনিকেতনে আসেন, রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে সংবর্ধিত করলেন। এদিকে সাহিত্য রচনা তো চলেইছে। সেটা পুরোপুরি 'সবুজপত্রের'ই যুগ। রচিত হলো 'বলাকা'র অধিকাংশ কবিতা, তা ছাড়া 'ঘরে বাইরে' নামে উপন্যাস ও 'চতুরঙ্গে'র গল্প চারিটি। জুন মাসে ভারত-সম্রাট তাঁকে 'নাইট' উপাধি দিলেন। এই বছরেই গ্রীষ্মকালটা রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে কবি কাশ্মীরে কাটালেন।

ইতিমধ্যে ইউরোপে মহাসমর বাধলো। কবি আগাগোড়াই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন, বরাবরই শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। এরি মধ্যে ১৯১৬ সালে তিনি জাপানে রওনা হলেন। এইটেই তাঁর চতুর্থবার সমুদ্রযাত্রা। পিয়ার্সন, মুকুল দে আর এণ্ডরুজ তাঁর সঙ্গী

হলেন। পথে রেঙ্গুনে চারদিন অপেক্ষা করে গেলেন। ব্রহ্মবাসীরা অপূর্ব সমারোহের সঙ্গে তাঁকে অভিনন্দন জানালো।

জাপানে প্রথমটা তিনি সরকারী অভিনন্দন যথেষ্টই পেয়েছিলেন। কিন্তু টোকিও এবং কিওগিজিকু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে জাপানের সরকারী তরফ বিরূপ হয়ে ওঠে। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে কবি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হলেন। আমেরিকায় তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করে যে বক্তৃতা দেন, ইংরেজ-প্রেমিক আমেরিকান সংবাদপত্রগুলিকে বিরূপ করবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। যাই হোক বোস্টন শহরে কবি অকৃত্রিম সংবর্ধনা লাভ করলেন। শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতির উপর যে সমস্ত বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন, তা তাঁর 'পারসোন্যালিটি' নামক ইংরেজি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

১৯১৭ সালে কবি জাপান হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে তখন 'বিচিত্রা ক্লাবে'র অধিবেশন পুরোদমে চলছে। উদ্যোগী হলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এসে যোগ দেওয়াতে আনন্দ যেন আরো উচ্ছলিত হয়ে উঠলো। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তখন চলতি বাংলাকে পাংক্তেয় করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। কবি তাঁর মতামত কথ্য ভাষার অনুকূলেই দিলেন। শুধু মত দেওয়াই নয়, সেই থেকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও কবি মোটামুটি চলতি বাংলার অনুশাসনই মেনে এসেছিলেন।

১৯১৭ সালে কলকাতায় কবির জন্মোৎসব করা হয়েছিল। জুলাই মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে যে অভিনন্দন জানালেন, সেটি পড়লেন স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। এই সময় কবি পুনর্বার জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন। ১৬ই জুন তারিখে মিসেস আনি বেসান্ত অন্তরীণ হলেন। কবি তাঁর প্রতিবাদ

জ্ঞাপন করলেন। আলফ্রেড থিয়েটারে পড়লেন 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। মালবীয়জির অনুরোধে রচিত হলো 'দেশ দেশ নন্দিত করি' নামে জাতীয় সংগীতটি।

ঐ সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে মডারেট আর চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করলেন চরমপন্থীদের। চরমপন্থীরা আনি বেসান্তের অনুকূলে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে মডারেটদের বিরোধিতা সত্ত্বেও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হলো। কিন্তু পরে যখন মডারেটরা আনি বেসান্তের নির্বাচনই মেনে নিলে, তখন রবীন্দ্রনাথ মডারেট নেতার অনুকূলে পদত্যাগ করলেন। 'বিচিত্রা ক্লাব হলে' কবি 'ডাকঘর' অভিনয় করলেন। অভিনয়ে গান্ধীজি, তিলক, মালবীয়জি, আনি বেসান্ত প্রভৃতি দেশনেতৃগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই বছরও তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত বইএর ইংরেজি তর্জমা ম্যাকমিলান কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত হলো।

১৯১৮ সালে ভারত-সচিব মণ্টেগু জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে শান্তিনিকেতনে স্যাডলার কমিশনের সদস্যদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সময়ে 'তোতাকাহিনী' নামে একটি বিদ্রূপাত্মক রচনায় তিনি সরকারী তত্ত্বাবধানে শিক্ষা পরিচালনার ব্যর্থতা প্রদর্শন করেন।

মে মাসে পিয়ার্সন চীনে ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ধৃত হলে রবীন্দ্রনাথ দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েন। কয়েকদিন পরে বৃহত্তর দুঃখ এলো। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা (বেলা) কলকাতায় প্রাণত্যাগ করলেন। মর্মাহত কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন।

১৯১৯ সালের প্রথম দিকে কবি সমস্ত দক্ষিণ ভারত পর্যটন করলেন। এই সময় 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে'র চ্যান্সেলর হিসাবে

তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা স্মরণীয়। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তিনি 'লিপিকা' নামক বিখ্যাত কথিকা-গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

'নাইট' উপাধি ত্যাগ

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটলো। খবরটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্যে যথেষ্ট সরকারী সাবধানতা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের কানে খবরটি পৌঁছল। কবি তখন ছিলেন শিলংএ। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি নেমে এলেন কলকাতায়, নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁদের বললেন, 'আপনারা প্রতিবাদ সভার আয়োজন করুন। সভাপতিত্ব করতে আমি রাজী আছি।' কিন্তু নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করলেন। অগত্যা সমস্ত দেশের প্রতি এই বিরাট অবিচারের প্রতিবাদ কল্পে কবি একক দাঁড়ালেন। ৩০শে মে তারিখে তিনি বড়লাট বাহাদুরের কাছে তাঁর 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করে যে পত্র লেখেন, তা ভাষার তেজস্বিতায় আর নির্ভীক ন্যায়ের প্রাখর্যে অমর হয়ে রয়েছে। তিনি লিখছেন—

মাননীয় বড়লাট বাহাদুর,

স্থানীয় সামান্য গোলযোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে পঞ্জাব সরকার যে প্রচণ্ড দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তার থেকেই আমরা গভীর আঘাতের সঙ্গে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি যে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে আমরা কী অসহায়। দুর্ভাগা জনসাধারণের উপর যে শাস্তি বিধান করা হয়েছে, তার অযৌক্তিক নির্দয়তার তুলনা, দু' একটি দৃষ্টান্ত বাদ দিলে সমগ্র ইতিহাসে দুর্লভ। বিশেষ করে, এ কথা যদি স্মরণ করি, যে নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল জনগণের প্রতি

এই দুর্ব্যবহার করেছেন সেই সরকার, মারণাস্ত্রের ব্যবহারে যাঁরা মানবসমাজে নিপুণতম,—তখন রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার অজুহাতেও একে ক্ষমা করতে পারি না, ন্যায় বিচারের দিক থেকে তো নয়ই। পঞ্জাবে আমাদের ভাইবোনদের উপর যে অপমান ও অত্যাচার হয়েছে, সরকারী তরফ থেকে চাপা দেবার চেষ্টা সত্বেও তা ভারতের প্রান্ত-প্রত্যন্ত দেশে পৌঁছেছে; আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে যে বিরূপতা ধূমায়িত হ'য়ে উঠেছে, সরকার তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন;—সম্ভবতঃ তাঁরা মনে মনে এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন যে, এইবার এ-দেশীয়দের 'আক্কেল' হবে। এই সরকারী হৃদয়হীনতা অধিকাংশ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রেরই সমর্থন লাভ করেছে, কোন কোনটি আবার আমাদের দুর্দশা নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করে পাশবিকতার চূড়ান্ত করেছেন। আর, যে সরকার এ দেশীয় অত্যাচারিতদের মর্মবেদনা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত যাতে না হয়, সেজন্য সজাগ, সেই সরকার এতে বিন্দুমাত্র বাধা দেন নি। আমি জানি যে আবেদন ব্যর্থ হয়েছে, এবং যে সরকার শারীরিক বলে বলীয়ান, সে ইচ্ছা করলেই সামান্য মহানুভবতা দেখাতে পারতো,—প্রতিশোধের লিপ্সায় তার দৃষ্টি অস্বচ্ছ। অতএব আমি যা করতে পারি, তা হলো এই, আমার দেশের যে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ দুঃখে ভয়ে নির্বাক হ'য়ে আছে, তাদের হ'য়ে সমস্ত দায়িত্ব আমার স্কন্ধে নিয়ে আমি তাদেরই হ'য়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই সময়ে সম্মানের চিহ্ন আমাদের লজ্জাকে আরো বেশি দুঃসহ করে তুলছে। তাই আজ আমি সমস্ত বিশিষ্ট সম্মানের বোঝা ফেলে দিয়ে দাঁড়াতে চাই আমার দেশবাসীদের পাশে, কেবলমাত্র নগণ্য বলে যারা অমানুষিক অত্যাচারের পাত্র। এই কারণেই আপনার কাছে আমার নিবেদন এই যে আমাকে 'স্যার' উপাধির বোঝা থেকে মুক্তি দিন। এই সম্মান আপনার পূর্ববর্তী লাটবাহাদুর আমাকে মহামান্য সম্রাটের হ'য়ে অর্পণ

করেছিলেন। অবশ্য তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা এর দ্বারা কিছুমাত্র লাঘব হলো না।

কলিকাতা
৬, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন,
৩০শে মে, ১৯১৯।

আপনার বিশ্বস্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এভাবে সরকারী খেতাব বর্জনের যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তা শুধু এদেশের সীমান্তেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সমগ্র সভ্য জগতেই এই প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

১৯১৯ সালের জুলাই মাসে 'বিশ্বভারতী'র কাজ শুরু হয়েছিল। কবি স্বয়ং অধ্যাপনার ভার নিয়েছিলেন। তিনি প্রধানত ব্রাউনিং-এর কাব্যই পড়াতেন।

পরের বছর রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতির সঙ্গে পশ্চিম ভারত ভ্রমণে বার হলেন। এপ্রিল মাসে গান্ধীজির আমন্ত্রণে কবি গুজরাট সাহিত্যমন্দিরে একটি বক্তৃতা দেন। সবরমতী আশ্রমে তিনি একরাত্রি বাস করেছিলেন।

প্রাচ্যের বাণী প্রচার

১৯১৯ সালেই মে মাসে কবি পঞ্চমবার বিদেশ যাত্রা করলেন। লণ্ডনে গিয়ে দেখেন রক্ষণশীল দল তাঁর উপর বিরূপ। কেননা, তিনি স্যার উপাধি ত্যাগ করেছেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিন্দা করেছেন। অবশ্য উদারনৈতিক এবং যথার্থ শিক্ষিত ইংরেজরা সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সোহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন।

ইংলণ্ডের আবহাওয়া কবির কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলো। ফ্রান্সের মাটিতে পা দিয়ে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ফ্রান্সে তিনি ছিলেন M. Kahn নামে একজন ধনকুবেরের অতিথি। এখানেই তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি এবং মঃ লে ব্রাঁর

সঙ্গে দেখা হলো। লে ব্রাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর নব-পরিণীতা বধূ। কথায় কথায় জানা গেল, রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গেই এই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অতঃপর কবি মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের যে-সব স্থান বিধ্বস্ত হয়েছিল, সেই সব অঞ্চল পরিদর্শন করলেন। ১৯শে আগস্ট তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত মনীষী বার্গসঁর পরিচয় হলো, দু'জনে বহুক্ষণ আন্তরিকতাপূর্ণ আলাপ আলোচনা করলেন। ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী মহিলা কবি কাউন্টেস দ্য নোয়ালির আলাপ হলো। নোয়ালি জানালেন যে, মহাযুদ্ধ যখন ঘোষণা করা হলো, তখন তিনি আর ক্লেমেসঁ এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা সদ্যপ্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি'র ফরাসী তর্জমা পড়ে উত্তেজনা লাঘব করেছিলেন।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ হল্যাণ্ডের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে ওলন্দাজদের কাছে অপ্রত্যাশিত সংবর্ধনালাভ করলেন। পনেরো দিন তিনি হল্যাণ্ডে কাটিয়েছিলেন। হেগ, রটারডম, আমস্টার্ডম সর্বত্র কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের জয় জয়কার। রটারডমের গীর্জার বেদী থেকে তিনি তাঁর বাণী দিলেন—"The Message Of The East."

হল্যাণ্ড থেকে বেলজিয়মে। এণ্টোয়ার্প, ব্রুসেলসেও কবির বক্তৃতা হলো। সেখান থেকে প্যারি হয়ে লণ্ডনে ফিরে এলেন। আমেরিকার জনমত তখন ছিল কবির প্রতিকূল। কিন্তু কবি গিয়েছেন প্রতীচীকে প্রাচ্যের বাণী শোনাতে, তুচ্ছ প্রতিকূলতা গ্রাহ্য করলে তাঁর চলবে কেন? অক্টোবর মাসে তিনি আমেরিকা রওনা হয়ে গেলেন। বললেন "প্রাচ্যের বাণী ওদের শোনাবোই, এই আমার পণ।"

নিউইয়র্ক, হার্ভার্ড, শিকাগো, টেক্সসে কবি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত-বিরোধীদের প্রচারকার্যের বিরাম ছিল না। এই কারণে কবি 'বিশ্বভারতী'র জন্যে অর্থসাহায্য লাভে বেশি সফল

হতে পারলেন না। বিপক্ষ কুৎসা রটালে, তিনি নাকি জার্মানীর চর, আর ব্রিটিশরাজের পরম শত্রু। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে কবি ফিরে এলেন ইউরোপে।

প্যারি, ম্যুনিক, ভিয়েনা প্রভৃতি স্থানে কবি বক্তৃতা দিলেন। ফ্রান্সে এপ্রিল মাসে তাঁর সঙ্গে রোমাঁ রলাঁর সাক্ষাৎকার হলো,—কাইজারলিংএর সঙ্গে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হলেন জার্মানীতে। জার্মানীতে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে জার্মান ভাষার সেরা বইগুলি উপহার পেলেন। জার্মানী থেকে রবীন্দ্রনাথ ডেনমার্ক গেলেন, সেখান থেকে সুইডেন। সুইডিস একাডেমি ইতিপূর্বে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছে, এবার তাঁকে অভূতপূর্ব সংবর্ধনা জানালে। আর্চবিশপ বললেন,—"শিল্প এবং ধর্ম যাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছে, নোবেল পুরস্কার পাবার অধিকারী তিনিই। রবীন্দ্রনাথ শুধু স্রষ্টা নন, তিনি দ্রষ্টাও।"

সুইডেন থেকে ফের জার্মানী হয়ে রবীন্দ্রনাথ ৬ই জুলাই তারিখে বোম্বাই পৌঁছলেন, এবং সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে।

দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলনের চরম উত্তেজনা। জনমতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতে মিল হলো না। তিনি তাঁর 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধ পড়লেন; তাতে তিনি অসহযোগের বিরুদ্ধে আপন মত ব্যক্ত করলেন। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন 'শিক্ষার বিরোধ' নামক প্রবন্ধে। মহাত্মাজীরও উত্তর পাওয়া গেল 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র 'দি গ্রেট সেন্টিনেল' নামক প্রবন্ধে। সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজি স্বয়ং গেলেন শান্তিনিকেতনে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে দু'জনের আলোচনা চললো।

এই বছরেরই বর্ষাকালে কবি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবের প্রবর্তন করলেন। কবি তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি বর্ষার কবিতা আবৃত্তি করলেন,—নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ মৃদঙ্গে

দিলেন তাল। আজ শান্তিনিকেতনে যে 'বর্ষামঙ্গল' এত সমারোহের উৎসব, তার শুরু এখানেই হয়েছিল।

পিয়ার্সন এলেন পাঁচ বছর পরে, এলেন এলমহার্স্ট। এলমহার্স্ট তাঁর ভাবী পত্নীর কাছ থেকে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এলেন। ডিসেম্বর মাসে 'বিশ্বভারতী'র উদ্বোধন হলো। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উদ্বোধন করলেন। প্রথম যুগ্মসচিব নিযুক্ত হলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর প্রশান্ত মহলানবীশ। এক দানপত্রে কবি তাঁর নোবেল প্রাইজের সব টাকা, তাঁর গ্রন্থ-স্বত্ব শান্তিনিকেতনের যাবতীয় সম্পত্তি 'বিশ্বভারতী'কে অর্পণ করলেন। অধ্যাপক সিলভ্যা লেভি ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন 'বিশ্বভারতী'র কাজে।

এই সময় 'মুক্তধারা' নাটক লেখা হয়েছিল। নাটকটি মঞ্চস্থ করবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, এমন সময় কবি খবর পেলেন মহাত্মা গান্ধীর ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। অভিনয় স্থগিত রইলো।

অতঃপর কবি শেলীর শতবার্ষিকী সভায় যোগ দিলেন; কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিসভায় তাঁর বিখ্যাত শোকগাথা পড়ে শোনালেন। 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী'র উদ্বোধন হলো কলকাতায়, ম্যাডান থিয়েটারে কবি সদলে 'শারদোৎসব' অভিনয় করলেন।

এর পর কবি কিছুদিন পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করেন। বোম্বাই, পুণা, মাদ্রাজ, কলম্বো সর্বত্র তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বভারতী'র আদর্শ প্রচার করেন। প্রায় তিন মাস পরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলো।

১৯২৩ সালের গ্রীষ্মকালটা কবি শিলংএ কাটালেন। 'রক্তকরবী' নাটকটি সেখানেই রচিত।

চীনের চিত্তজয়

১৯২৭ সালের মার্চ মাসে কবি লিয়াং-চি-চাওয়ের আমন্ত্রণে চীন যাত্রা করলেন। এবারকার সঙ্গী হলেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ। পথে রেঙ্গুনে, পেনাংএ, সিঙ্গাপুরে সংবর্ধনা কুড়োলেন প্রচুর। তারপর পৌঁছলেন সাংহাই-এ। সাংহাই-এ চীনবাসীদের কাছে ভারত আর চীনের মধ্যেকার অচ্ছেদ্য বন্ধনের বাণী প্রচার করলেন। জাপানী শ্রোতাদের তিরস্কার জানালেন তাদের সাম্রাজ্যবাদের জন্যে এবং এশিয়ার পক্ষে পাশ্চাত্যদেশের কবল হতে নিষ্কৃতি লাভই যে শ্রেয়ঃ এ অভিমতও তাঁর বক্তৃতায় প্রকাশ পেলো।

অ্যাংলো-আমেরিকান কাগজগুলো নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো, কারণ কবির বক্তৃতায় তাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছিল। তাঁর প্রাচ্য আদর্শের বাণী প্রথমে চীনা ছাত্রদেরও মনোমত হয়নি, কারণ তারা সবে পশ্চিমের ভাব-ধারায় স্নান করে উঠেছিল। কিন্তু অবশেষে যা অনিবার্য তাই ঘটলো, কবি আপন ব্যক্তিত্বের মহিমায় চীনের চিত্ত জয় করলেন।

চীন থেকে কবি গেলেন জাপানে। সেখানে নির্বাসিত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে কবির আলাপ হলো। জুলাই মাসের শেষে কবি ভারতে ফিরে এলেন।

দেশে এসে বেশি দিন থাকা তাঁর সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্য থেকে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ এলো। সেপ্টেম্বর মাসে কবি দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করলেন। আর্জেন্টাইনে তিনি অতুলনীয় সংবর্ধনা লাভ করলেন। তাঁর 'পূরবী'র কবিতাগুলি এখানেরই রচনা, এবং তিনি এখানে যাঁর অতিথি হয়েছিলেন, সেই ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

(বিজয়া)-কে 'পূরবী' উৎসর্গ করেন। ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে কবি ইটালী হয়ে দেশে ফিরে এলেন।

দেশে ফেরার অল্পকালের মধ্যেই রাঁচিতে তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৃত্যু হলো। কিছুকাল পরে শান্তিনিকেতনে তাঁর ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে উৎসব হলো। মে মাসে গান্ধীজি আবার এলেন শান্তিনিকেতনে।

জুন মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাপ্রয়াণ করলেন। এই উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশের মর্মবেদনা তিনি চারটি ছত্রের একটি শ্লোকে গেঁথে দিলেন ঃ

এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই সময়ে এক জনসভায় কবিকে আক্রমণ করেন,—তিনি খদ্দর কেন পরেন না, তার কৈফিয়ৎ চান। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও ছিলেন সে আক্রমণের আর এক লক্ষ্য। কবি উত্তর দিতে বাধ্য হলেন 'সবুজপত্রে'—'স্বরাজ সাধন' নামক একটি প্রবন্ধে। জানালেন, চরকায় তাঁর বিশ্বাস নেই। প্রফুল্লচন্দ্রের তিরস্কারের উত্তরে তিনি 'সবুজপত্রে' আরও একটি প্রবন্ধ লেখেন 'চরকা' নামে। বিজ্ঞানী বন্ধুর চরকা-প্রীতিতে বিস্ময় প্রকাশ করে তাতে তিনি লিখলেন, "সকল মানুষ মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজ-বিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজ সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না।" গান্ধীজি তথা কংগ্রেসের চরকা ও খদ্দর নীতি এবং খিলাফৎ আন্দোলনের

অসারতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহ ছিলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এবং জনগণের এক বিপুল অংশের বিরাগ-ভাজন হবেন জেনেও তিনি তাঁর সেই অভিমত উক্ত দুই প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাষায় প্রকাশে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় প্রথম ফিলজফিক্যাল কংগ্রেস বসলো। কবি তাতে সভাপতিত্ব করলেন।

পরের বছর তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করলেন। কবি তখন লক্ষ্ণৌএ গিয়েছেন নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন উপলক্ষ্যে। ফেব্রুয়ারী মাসে কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে 'ফিলজফি অব আর্ট' নামে একটি প্রবন্ধ পড়লেন। ঢাকা থেকে গেলেন আগড়তলা; তারপর ফিরলেন শান্তিনিকেতনে।

ইতালীর আকাশতলে

১৯২৬ সালের মে মাসে কবি অষ্টম বার বিদেশ ভ্রমণে বার হলেন। ইতালী থেকে ঘন ঘন আহ্বান আসছিল। নেপলসে মুসোলিনীর প্রতিনিধিরা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। নেপলস থেকে স্পেশাল ট্রেনে করে কবিকে রোমে নেওয়া হলো। সেখানে মুসোলিনী কবিকে স্বাগত সম্ভাষণ করলেন। জানালেন, ইতালীয় ভাষায় কবির যে ক'টি বই অনূদিত হয়েছে তার কোনটিই তাঁর অপঠিত নেই। কবির অসংখ্য অনুরাগী পাঠকদের মধ্যে তিনিও একজন।

ইতালীতে অসংখ্য সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে ধরলেন, ফ্যাসিজম সম্পর্কে তাঁকে অভিমত দিতে হবে। কবি কৌশলে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেলেন, বললেন, 'প্রার্থনা করি এই অগ্নিস্নানে ইতালীর অমর আত্মা শুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসুক।' রাজার সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হলো। তাঁর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে কবি মুগ্ধ হলেন।

মুসোলিনীর সঙ্গে কবি পুনরায় সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা করলেন। ইতালীতে 'চিত্রাঙ্গদা'র অভিনয় হলো। জনতার ঘন ঘন করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ উঠলো মুখরিত হয়ে। কবি দাঁড়িয়ে উঠে দর্শক-সাধারণকে তাঁর প্রত্যভিবাদন জানালেন। ফ্যাসিস্ট মত-বিরোধী বিখ্যাত দার্শনিক ক্রোচে তখন রোমে ছিলেন না। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি সারারাত ভ্রমণ করে কবির কাছে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন,—"আপনার কবিতা কী যে ভালো লাগে তা বলা যায় না। প্রাচ্যদেশের কবিতাকে কল্পনা-সর্বস্ব বলে ভেবে নিয়েছিলুম, আপনার কাব্য পড়ে জানতে পারলুম, তা নয়।" রোম থেকে কবি গেলেন ফ্লোরেন্সে, টুরিণে, জুরিখে, গেলেন লুসার্ণে। সর্বত্র বক্তৃতা, সর্বত্র সংবর্ধনা, জয়-জয়কার। জুরিখে এক অধ্যাপক-পত্নীর সঙ্গে কবির আলাপ হলো। তাঁর কাছে কবি ফ্যাসিজমের অত্যাচারের কাহিনী জানতে পারলেন। অন্যায়ের সঙ্গে কবির সন্ধি নেই, তিনি 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে' এক পত্র লিখে তাঁর অভিযোগ লিপিবদ্ধ করলেন। ইতালীর সংবাদপত্র তাঁর উপর বিরূপ হলো। কবি চলে গেলেন লণ্ডনে।

লণ্ডন থেকে নরওয়ে। নরওয়ের রাজার সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হলো। স্টকহোমে তিনি মিলিত হলেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোহান বোয়ারের সঙ্গে। প্রত্যাবর্তনের পথে গেলেন বার্লিন। প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ তাঁকে সংবর্ধিত করলেন। ড্রেসডেন, কোলন, প্রাগ, বুখারেস্ট, এথেন্স। যেখানেই বক্তৃতা দিয়েছেন সেখানেই জনতার উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পেয়েছেন, পেয়েছেন আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য যা কোন সম্রাটেরও জোটেনা। গ্রীসের রাজা তাঁকে 'অর্ডার অব দি স্টার' পর্যায়ভুক্ত করে নিলেন, আর কায়রোতে গেলে তাঁর সম্মানে মিশরীয় পার্লামেন্টের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হলো। ডিসেম্বরে কবি ফিরে এলেন স্বদেশে।

১৯২৭ সালে কলকাতায় 'নটীর পূজা' অভিনীত হলো। মার্চে

শান্তিনিকেতনে অভিনীত হলো 'নটরাজ'। এপ্রিলে চন্দননগরে গিয়ে কবি 'প্রবর্তক সংঘে'র প্রার্থনা-সভার ভিত্তি স্থাপন করলেন। তারপর কিছুকাল কাটালেন শিলংএ। এখানে 'তিন পুরুষ' (পরে নাম দেওয়া হয় 'যোগাযোগ') উপন্যাসের শুরু হলো।

জুলাই মাসে কবি পুনরায় বিদেশযাত্রা করলেন। সঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ কর, আর শ্রীধীরেন্দ্র দেব বর্মন। এবার আর পশ্চিম নয়,—এবার 'দ্বীপময় ভারত'। সিঙ্গাপুর, মালাক্কা, পেনাং, বাটাভিয়া। সমুদ্র-পথে তিনি যবদ্বীপের উপর যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন, বাটাভিয়াতে তার ইংরাজী অনুবাদ পড়া হলো। কবিতাটি পরে যবদ্বীপের ভাষায় তর্জমা করা হয়, এবং তা প্রশংসিতও হয়। অক্টোবর মাসে কবি গেলেন ব্যাংককে। অসংখ্য শ্যামবাসী, চীনবাসী আর ইউরোপীয় তাঁকে অভিনন্দন জানালো, রাজা স্বয়ং স্বাগত সম্ভাষণ করলেন। অক্টোবরেই কবি কলিকাতায় ফিরলেন।

১৯২৮ সালে কবি পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। লিখলেন,—"বহু বছর পূর্বে যখন অরবিন্দ যুবক ছিলেন, তখন লিখি, 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।' আজ বহু বছর পর অরবিন্দকে দেখলুম, তিনি জ্ঞানে, বিভূতিতে মণ্ডিত। আজও নীরব ভাষায় বলি, 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'" কবি সিংহলে গেলেন, ফেরবার পথে বাঙ্গালোর। এখানেই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'শেষের কবিতা' শেষ হলো। কলকাতায় তখন ব্রাহ্ম-সমাজের শতবার্ষিকী উৎসব। রবীন্দ্রনাথ 'The Message of Ram Mohon Roy' নামে একটি প্রবন্ধ পড়লেন। 'মহুয়া'র অতুলনীয় কবিতাগুচ্ছ এই বছরেই লেখা ও প্রকাশিত হয়েছিলো।

১৯২৯ সালে কবি 'কানাডা ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনে'র নিমন্ত্রণে কানাডা রওনা হলেন। পথে টোকিওতে দু'দিন বিশ্রাম করে অবশেষে ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে উপস্থিত হলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমন্ত্রণ এলো বক্তৃতা দেবার। কিন্তু লস্ এঞ্জেলিসে ঘটলো বিপত্তি। কবির পাসপোর্টখানি খোয়া গেল। অফিসারেরা মহা হৈ-চৈ শুরু করে দিলে। বিরক্ত হয়ে কবি তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে চলে গেলেন জাপানে। জাপানে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার পর ইন্দোচীনে ফরাসী সরকার তাঁকে যথেষ্ট সংবর্ধনা করলেন। জুলাই মাসে কবি ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে।

এই বছরই কবি তাঁর 'রাজা ও রাণী' নাটকটিকে 'তপতী' নাম দিয়ে ঢেলে সাজেন, এবং স্বয়ং জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রাজা বিক্রমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

১৯৩০ সালে কবি ছবি আঁকায় মন দিলেন। জানুয়ারী মাসে বরদার গায়কোয়াড়ের নিমন্ত্রণে সেখানে যান, এবং 'Man, the Artist' প্রবন্ধ পাঠ করেন। মার্চ মাসে কবি পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন তাঁর একাদশ বারের বিদেশ ভ্রমণে। মার্সাইতে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট মাসারিকের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হলো। কবি প্যারিসে তাঁর নিজের চিত্র-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। মে মাসে গেলেন বার্মিংহামে, সেখানে মহাত্মাজির লবণ-সত্যাগ্রহের সংবাদ তাঁর কর্ণগোচর হলো। শুনলেন ভারতে ব্রিটিশ স্বৈরতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারের ইতিহাস, ভাইসরয়ের অর্ডিন্যান্স, ঢাকার দাঙ্গা আর গ্রেপ্তারের হিড়িক। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে' একটি স্মরণীয় চিঠি প্রকাশ করলেন।

অক্সফোর্ডে কবিকে 'হিবার্ট লেকচার' দিতে হয়েছিলো। ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে কবি তাঁর 'মানুষের ধর্ম' (Religion of Man)-এর আদর্শ ব্যাখ্যা করলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে স্যার মাইকেল স্যাডলার বললেন, 'আপনি আমাদের মধ্যে যে প্রেরণা আজ এনে দিলেন, তা জীবনেও ভোলা সম্ভব হবে না।'

বিলাত থেকে রবীন্দ্রনাথ গেলেন জার্মানীতে। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। গ্যালারী মোলেরে তাঁর চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে, তিনি গেলেন সেখানে। ম্যুনিক, ড্রেসডেন হয়ে কবি সেপ্টেম্বর মাসে গেলেন সোভিয়েট রাশিয়ায়।

সোভিয়েট রাশিয়ায়

ইতিপূর্বে কবি সোভিয়েট রাশিয়ায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেটা ১৯২৬ সাল। কিন্তু ভিয়েনায় তাঁর ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো। কাজেই সে যাত্রা সোভিয়েট দর্শন তাঁর ঘটে ওঠেনি। এবার স্বয়ং লুনাচারস্কী বার্লিনে এলেন সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে।

কবির সঙ্গী ছিলেন শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী, ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সেক্রেটারি উইলিয়মস। মস্কোতে Voks (ফোক)-বিল্ডিংএ কবিকে সংবর্ধনা করা হলো। সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি মঃ পেট্রফ কবিকে অভিনন্দিত করলেন, বললেন—"আমাদের সৌভাগ্য, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কবিকে আমাদের মধ্যে আজ পেলাম।" এখানে তাঁর সঙ্গে মাদাম লিটভিনফ, সুলেখক গ্রাডকফ প্রভৃতির সাক্ষাৎ হলো। 'পায়োনিয়ার কম্যুনে' কবি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নানা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন, গেয়ে শোনালেন তাঁর 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' গানখানি।

মস্কোর সরকারী ম্যুজিয়মে কবির চিত্রপ্রদর্শনী উন্মুক্ত হলো। টলস্টয়ের 'রেজারেকসনে'র অভিনয় কবি প্রথম দেখলেন মস্কোর আর্ট থিয়েটারে।

কিছুকাল রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়ার নতুন জাগরণের পীঠস্থানগুলি পরিদর্শন করলেন বিমুগ্ধ বিস্ময়ে। বললেন, 'যা দেখছি, সবই বিস্ময়কর ঠেকছে।' মস্কো থেকে কবি বিদায় নিলেন

সেপ্টেম্বর মাসের ২৫শে। তারপর বার্লিন হয়ে গেলেন নিউইয়র্কে। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে কবি ভারতে ফিরে এলেন।

রাশিয়া থেকে তিনি ভারতীয় বন্ধুদের কাছে যে-সব পত্র প্রেরণ করেছিলেন, সেগুলো 'রাশিয়ার চিঠি' নামে সংকলিত হলো। এই সব চিঠি পড়লে জানা যায়, রুশদেশের অভিনব সৃষ্টি-পরিকল্পনা তাঁকে কতখানি মুগ্ধ করেছিল। কবি পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে ভ্রমণ করেছেন। পাশ্চাত্যদেশের মোহিনী সভ্যতার রূপ তাঁর অজানা ছিল না। তারই পাশাপাশি ভারতবর্ষেরও যথার্থ রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন কবি অন্তর দিয়ে। দেখেছেন এদেশের অশিক্ষা আর দারিদ্র্য, কলহ আর কুসংস্কার। তাই রাশিয়ার এই নতুন সভ্যতার রূপ তাঁকে অভিভূত করলো। লক্ষ্য করে দেখলেন, যার সাধনায় তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করেছেন, অক্লান্ত খেটেছেন শ্রীনিকেতনের মাঠে মাঠে, এ তারই বড়ো এবং সার্থক সংস্করণ।

রাশিয়াতে তখনো পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। রাষ্ট্র-জীবনের বহু প্রদেশে তখনো চলছিল পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা, এবং আনুষঙ্গিক কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি। কিন্তু সেই সব তুচ্ছ স্খলনের মধ্য দিয়েও কবি রাশিয়ার যথার্থ রূপটি উপলব্ধি করে নিলেন। কেবল এক শ্রেণীর মানুষকেই মানুষ বলে স্বীকার করে নেওয়া, এবং বাকি মানুষকে শোষণ ও শাসনের চাপে মৃতকল্প করে রাখা, ধনিক শাসন-ব্যবস্থার এইটেই হলো আসল চেহারা। তথাকথিত সমস্ত 'সভ্যদেশে'ই এই একই পালার রকমফের। কিন্তু রাশিয়া স্বতন্ত্র। "সেখানে এই সব সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা একেবারে গোড়া ঘেঁসে চলছে।"

১৯৩১ সালে কলকাতায় কবির সত্তর বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে জয়ন্তী হলো। পৃথিবী জুড়ে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী মনীষীবৃন্দ এই উপলক্ষ্যে যে-সব বাণী প্রেরণ করেছিলেন তা 'Golden Book of Tagore'-এ সংকলিত করে কবিকে উপহার দেওয়া হলো।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে এই উপলক্ষ্যে সম্মানে অভিষিক্ত করলেন।

ইতিপূর্বে অক্টোবর মাসে হিজলি জেলে দু'জন বন্দীকে নির্মম ভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। দেশময় বিক্ষোভ মূর্ত হলো কবির মর্মভেদী অভিভাষণে। মনুমেণ্টের পাদদেশে এক বিরাট জনসভায় কবি জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করলেন।

জয়ন্তী উৎসবের স্রোত বইছিল, এমন সময় দেশের ইতিহাস এসে দাঁড়ালো পথ-পরিবর্তনের পথে। ডিসেম্বর মাসে মহাত্মাজি, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি গ্রেপ্তার হলেন। ব্যথিত হয়ে কবি প্রধানমন্ত্রীকে তার করলেন। তাঁর বিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতাটি রচিত হলো এই সময়েই। কবি ভগবানের ন্যায়বিচারের উপর সন্দিহান হয়ে বিদ্রোহ-পতাকা তুললেন, লিখলেন—

"তাই তো তোমারে শুধাই অশ্রুজলে,
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?"

১৯৩২ সালে পারস্যের শাহের আমন্ত্রণে কবি পারস্যে গেলেন। এবার বিমানযোগে। সিরাজে, ইস্পাহানে পেলেন অজস্র সম্মান,—গেলেন ইরাকে। সেখানেও রাজকীয় সংবর্ধনা। অতঃপর কবি জুন মাসে বিমানযোগে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এই বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে নতুন সম্মান দিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'রামতনু অধ্যাপক' নিযুক্ত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে পেলেন 'কমলা বক্তৃতা' দেবার ভার। এই বছরই 'পুনশ্চ', 'কালের যাত্রা' আর 'পরিশেষে'র কবিতাগুলি রচিত হলো। কবি 'কালের যাত্রা' শরৎচন্দ্রের ৫৭ বছর পূর্ণ হলে তাঁকে উৎসর্গ করলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধীর আমরণ উপবাসের সংকল্পে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হয়ে পড়লেন। কলকাতায় তাঁর যে সব কর্মসূচী ছিল, সব বাতিল করে দিয়ে কবি যারবেদা জেলে গান্ধীজির

কাছে ছুটে গেলেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে কবির তার গেল। অবশেষে ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী 'পুণা প্যাক্টে' সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। গান্ধীজি উপবাস ভঙ্গ করলেন, কবি গান্ধীজির শয্যাপার্শ্বে তাঁর প্রিয় একটি সংগীত গেয়ে শোনালেন।

ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সত্তর বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে যে-উৎসব হলো, কবি তাতে সভাপতিত্ব করলেন, তাঁর রচিত 'গান্ধীজি অ্যাণ্ড দি ডিপ্রেসড হিউম্যানিটি' পুস্তকটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে উৎসর্গ করলেন।

পরের বছর কবি রামমোহন শতবার্ষিকীতে পৌরোহিত্য করলেন। এই সময় কবি 'তাসের দেশ' আর 'চণ্ডালিকা' নামে নতুন দু'টি নাটক লেখেন। এম্পায়ার থিয়েটারে 'তাসের দেশ' অভিনীত হলো। কবি স্বয়ং 'চণ্ডালিকা' দর্শকদের পড়ে শোনালেন। 'বিচিত্রা' নামে চিত্রিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলো। বইটি কবি উৎসর্গ করলেন শ্রীনন্দলাল বসুকে। 'বাঁশরী', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ'ও এই সময়ের রচনা।

১৯৩৪ সালে পণ্ডিত জওহরলাল সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। এই সময় গান্ধী-বিরোধী আন্দোলন বাংলা দেশে প্রবল হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাতে প্রতিবাদ জানান। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ সিংহল যাত্রা করেন। তাঁর 'চার অধ্যায়' নামক উপন্যাসটি এইখানেই রচিত।

পরের বছর স্যার জন এণ্ডারসন শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করলেন। লাটসাহেবের জন্যে পুলিশী নজরের মাত্রাধিক্য ঘটলো। কবি বিরক্ত হয়ে আশ্রমের অধিবাসীদের পাঠিয়ে দিলেন শ্রীনিকেতনে, গভর্ণরকে খালি আশ্রম দেখেই প্রত্যাবর্তন করতে হলো।

এই বছর বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে 'ডক্টরেট' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর পঁচাত্তর বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে

তিনি 'শ্যামলী' নামে মৃৎকুটীরে গৃহপ্রবেশ করলেন। নভেম্বর মাসে জাপানী কবি নোগুচি শান্তিনিকেতনে এলেন। পরে নোগুচির সঙ্গে তাঁর জাপানের পররাষ্ট্র-নীতি নিয়ে যে-সব পত্র ব্যবহার হয়েছিল তাতে তিনি জাপানের সাম্রাজ্য-লিপ্সার তীব্র নিন্দা করেন।

১৯৩৫ সালে কবির 'শেষ সপ্তক' ও 'বীথিকা' কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ সালে কলকাতায় 'শিক্ষাসপ্তাহ' উপলক্ষ্যে কবি সিনেট হলে বক্তৃতা দেন। জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি. লিট. উপাধি দান করেন। কবি সে অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে পারেন নি। এই বছর কবি 'বিশ্বভারতী'র জন্যে সাহায্য ভিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত সফরে বার হলেন। দিল্লীতে মহাত্মাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। এই বয়সে কবির এত পরিশ্রম গান্ধীজিকে ব্যথিত করে তুললো। তাঁরই পরামর্শে কোনও এক অজ্ঞাতনামা দাতা কবিকে ৬০,০০০৲ টাকা দান করেন। জুলাই মাসে কবি কলকাতার টাউন-হলে সম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদকল্পে যে বিরাট জনসভা হয় তাতে সভাপতিত্ব করলেন।

১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষ্যে কবি নিমন্ত্রিত হলেন। কোনও বেসরকারী ব্যক্তির এই উপলক্ষ্যে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ এই প্রথম। কবি বাংলাতে তাঁর বক্তৃতাটি দিলেন। চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হলো। উদ্বোধন করলেন রবীন্দ্রনাথ। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি ছিলেন সে অনুষ্ঠানে।

এই বছর গ্রীষ্মকালে আলমোড়াতে কবি ছেলেদের জন্যে তাঁর নতুন বৈজ্ঞানিক বই 'বিশ্বপরিচয়' রচনা করেন। এই বইখানি উৎসর্গ করলেন বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। বইখানি পাঠ করলেই জানা যায়, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান কত গভীর।

আলমোড়া থেকে ফিরে কবি কিছুদিনের জন্যে পাতিসরে যান তাঁর জমিদারী পরিদর্শনে।

শেষ কয় বছর

সেপ্টেম্বর মাসে কবি সহসা বিসর্প রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। কলকাতা থেকে ডাঃ নীলরতন সরকার এবং আরো ক'জন বিচক্ষণ ডাক্তার শান্তিনিকেতনে গেলেন। ক'দিন কাটলো দারুণ উৎকণ্ঠায়। অবশেষে কবি কতকটা সুস্থ হলে তাঁকে কলকাতায় এনে চিকিৎসা করা হলো। কলকাতায় তখন গান্ধীজি, জওহরলাল প্রভৃতি ছিলেন নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন উপলক্ষ্যে। কবির সঙ্গে নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করলেন। এই সময়েই কবি তাঁর 'প্রান্তিক' নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

১৯৩৮ সালে লর্ড লোথিয়ান শান্তিনিকেতনে এলেন। কিছুদিন পরে লর্ড এবং লেডী ব্রাবোর্ণ সেখানে গেলেন। ডিসেম্বর মাসে লেডী লিনলিথগো তাঁর কন্যার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বেড়িয়ে গেলেন।

১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে সুভাষচন্দ্রের আমন্ত্রণে কবি 'মহাজাতি সদনে'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত করলেন। 'মহাজাতি সদন' তাঁরই দেওয়া নাম। ১৫ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে তিনি 'বিদ্যাসাগর ভবনে'র দ্বারোদ্ঘাটন করলেন।

১৯৪০ সালে গান্ধীজি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এলেন। কবি তাঁকে সংবর্ধিত করলেন। ৭ই আগস্ট তারিখে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দান করলেন। এই উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে অক্সফোর্ডের বিশেষ একটি সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন হলো। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার এবং স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করবার ভার দিয়েছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে কবি কালিম্পং গিয়েছিলেন। সেখানে ২৭শে তারিখে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হলো। আবার কিছুদিন কাটলো দারুণ অস্বস্তিতে। কবি সেই থেকেই প্রায় শয্যাগত হয়ে কাল কাটিয়েছেন। তবু তাঁর সাহিত্য সাধনার বিরাম ছিল না। এরি মধ্যে তিনি রচনা করেছেন 'নবজাতক', 'সন্ধি', 'ছেলেবেলা', 'তিন সঙ্গী', 'রোগশয্যায়' (১৯৪০-এর নবেম্বর—ডিসেম্বর) এবং 'আরোগ্য' (১৯৪১-এর জানুয়ারি—ফেব্রুয়ারি)। শেষের দু'খানি পুস্তকের নামই কবির অসুখের সাক্ষ্য, নইলে তাঁর আর কোনো বই-এর কোনো পৃষ্ঠায় রোগ কিম্বা জরার চিহ্নমাত্র নেই। বার্ধক্য কবির দেহকে পরাজিত করেছিল, কিন্তু অন্তর তাঁর চিরকালই ছিল নবীন। তাঁর মনের একটি দলও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মলিন হয়নি। দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করতে করতেও কবি বলেছেন, "কিছুদিন থেকে আমি দুঃসহ রোগদুঃখ ভোগ করে আসছি, সেইজন্যে যদি ব'লে বসি যারা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত তারাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হোতে পারে তা'হলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মল প্রসন্নতা আছে।" তাই তাঁর এই শেষ বই দু'খানির কবিতাগুলোতে রোগযন্ত্রণার কথা থাকলেও অসুখের মালিন্য নেই। জীবনকে উজ্জ্বলতর করে দেখবার জন্যে আপাত বিষয়বস্তু হলেও রোগ এখানে যেন একটা উপলক্ষ্য মাত্র। রোগ পরাজয় স্বীকার করেছে বিশ্বকবির জীবন-বন্দনার কাছে, দৈহিক ক্লেশ ও অপটুতা পেয়েছে লজ্জা।

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে কবির একাশী বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে উৎসব হলো। এ উৎসবে কবি 'সভ্যতার সংকট' নামে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতায় অল্প কয়েকটি কথায় তিনি ভারতে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করলেন।

যন্ত্রশক্তির সাহায্যে জাপান ও রাশিয়ায় জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, অথচ ইংরেজের অধীন ভারতে দারিদ্র্যের চিরস্থায়ী রাজত্ব। ইংরেজের নির্মম স্বার্থপরতার উল্লেখ করে কবি বললেন—

"ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দলপাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এত বড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্যে বলপূর্বক অহিফেন বিষে জর্জরিত ক'রে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম উত্তর চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতি-প্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ ব'লে গণ্য করেছিল। পরে এক সময় স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্ণমেণ্টের তলায় ইংলণ্ড কী রকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে।...

"সভ্য-শাসনের চালনায় ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্ম-বিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্ত-শাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠছে সে যদি ভারতশাসনযন্ত্রের উর্ধ্বস্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হোত তাহলে কখনই ভারত-ইতিহাসের এত বড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধি সামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্য দেশের সর্বপ্রধান

প্রভেদ এই, ইংরেজ শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষচ্ছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি এ'কে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি, সে তার পরিবর্তে দণ্ডহাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।...

"নিভৃতে সাহিত্যের রস সম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হলো তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারিনি, অবশেষে দেখছি একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে

তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহা প্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

"এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,

> অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
> ততো সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

> ঐ মহামানব আসে
> দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
> মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।

সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক,
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে॥"

'জন্মদিনে' ও 'গল্পসল্প' নামে দু'টি বইও তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হলো।

মনে যদিও কবি ঠিক আগের মতোই সতেজ ছিলেন, তাঁর দেহ ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। নিজের হাতে তিনি আর পারতেন না লেখনী ধরতে, অনুলিখনের উপর ভরসা করেই তাঁকে চলতে হতো।

অন্তিম শয্যায়

জুন মাসে ক'জন চিকিৎসক কবিকে শান্তিনিকেতনে পরীক্ষা করলেন। জুলাই মাসের ২৫ তারিখে চিকিৎসকদের পরামর্শক্রমে কবিকে কলকাতায় নিয়ে আসা হলো। ৩০শে জুলাই কবির শরীরে অস্ত্রোপচার করা হলো। অস্ত্রোপচার সফলই হয়েছিল, এবং তাঁর ক্ষতও এসেছিল শুকিয়ে। কিন্তু কবির জীবনীশক্তি হ্রাস পেয়ে অবস্থা তখন চরমে পৌঁচেছে। শহরের সেরা ডাক্তারদের ওপর তাঁর চিকিৎসার ভার দেওয়া হলো।

দু'তিন দিন থেকেই কবির চেতনা ছিল না, তবে মাঝে মাঝে যেন চেতনা ফিরে আসতো। বুধবার ২২শে শ্রাবণ (৬ই আগস্ট)

তারিখে তাঁর অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল। সেদিন সকালে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে তাঁর চেতনা ফিরে এসেছিল। তখন কবি অস্পষ্ট ভাষায় কী যেন বলে উঠেছিলেন। তারপর সমস্ত দিন কাটলো অচৈতন্য অবস্থায়। সে জ্ঞান আর ফেরেনি।

অবস্থা ক্রমেই উঠছিল সঙ্কটাপন্ন হয়ে। বেলা সাড়ে দশটার সময় ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিকে পরীক্ষা করে জানালেন, আশা নেই, পূর্বাহ্নেই জানিয়ে রাখি। সর্বক্ষণ টেলিফোন, বিরাম নেই। সকলেরই এক প্রশ্ন, 'কবি কেমন আছেন ?'

মধ্যরাত্রির পর থেকেই অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে লাগলো। রাত তিনটের পর শুরু হলো শ্বাসকষ্ট। আত্মীয়-স্বজন, অনুরাগী সকলে কবির শয্যাপার্শ্বে। প্রভাতী সংবাদপত্র মারফৎ প্রচারিত হলো কবির সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা। দলে দলে লোক এলো কবিকে শেষপ্রণাম নিবেদন করতে। সকাল সাতটায় স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবির শয্যাপার্শ্বে শেষবারের মতো উপাসনা করলেন। সে দিন ঝুলন পূর্ণিমা। তারিখ ২২শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট, ১৯৪১)। ঐ দিন মধ্যাহ্নে ১২টা ১০ মিনিটের সময় রবীন্দ্রনাথ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কবির ইচ্ছা অনুসারে তাঁর দু' বছর আগেকার রচিত নিম্নলিখিত গানটি তাঁর মৃত্যুর পর গীত হয়—

সম্মুখে শান্তি পারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথী,
লও লও হে ক্রোড় পাতি
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতির ধ্রুব-তারকা।
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া,
হবে চির পাথেয় চিরযাত্রার।

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি' লয়
পায় অন্তরের নির্ভয় পরিচয়,
মহা অজানার ॥

সুদীর্ঘ বিস্তৃত জীবনী-আলোচনায়ও রবীন্দ্রনাথের সত্যকার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। কবিগুরু নিজেই সেকথা লিখে রেখে গিয়েছেন, 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'। তাঁর সে কথা স্মরণ করেই রবীন্দ্র-জীবনী প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা যাক।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও বিশ্ববোধ

রবীন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বহুমুখী কর্মধারার কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তবু তাঁর কর্ম ও শিল্পের অনেকগুলি প্রদেশের স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এদেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথের আসল পরিচয় কবি হিসাবেই। কিন্তু বিদেশে যাই হোক, আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, ঊনবিংশ শতকে যখন এদেশের রাজনীতি প্রধানত ছিল রাষ্ট্র-শাসকের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা মাত্র, আমাদের নেতৃবৃন্দ ছিলেন 'আবেদন আর নিবেদনের থালা বহি বহি নতশির', সেই সময় তিনি তাঁর অজস্র গানে এবং বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সেই আন্দোলনকে জয়ের পথে, আত্মবিশ্বাসের পথে অগ্রসর করে দিয়েছিলেন। কবি আর স্বপ্নবিলাসী আমাদের প্রাত্যহিক অভিধানে সমার্থক। স্বপ্ন আর ফুল, অরণ্য আর কাকলি নিয়েই তাঁদের কারবার বলে আমরা মনে করি। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল হয়ত আংশিক অস্বচ্ছ, কুয়াসা ও বাষ্পে

ঢাকা। তারপর একদিন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ঘটেছিল, সেই সময়ে কবি-হৃদয় আর আকাশ করেছিল কোলাকুলি। কিছুকাল কাটলো, পৃথিবীর আনন্দধারায় কবি স্নান করে উঠলেন, অপার সৌন্দর্য অঞ্জলি ভরে করলেন পান। আর একদিন দ্বিতীয়বার তাঁর কল্পনা-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হলো। বাস্তবের সাক্ষাৎ মূর্তি কবি প্রত্যক্ষ করলেন।

মুক্তি আন্দোলনের সারথ্য গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। বললেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ।' বললেন—

যদি মান পেতে চাও প্রাণ পেতে দাও
—প্রাণ আগে করো দান।

তিনি আরো বললেন,—

আগে চল্, আগে চল্ ভাই।
পড়ে থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই।

জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হলো কলকাতায়, রবীন্দ্রনাথ গাইলেন, 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।' এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের উক্তিটি স্মরণ হয়, "It was Rabindranath who had first preached the duty of eschewing all voluntary associations with official activities and of applying ourselves to the organisation of our economic, social and educational life, independently of official control........"

স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে একথা স্বচ্ছন্দেই বলতে পারা যায় যে, জার্মানীর কাছে গ্যায়টে যা, হুইটম্যান যা আমেরিকার কাছে, আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথও তাই। আমাদের স্বদেশের আত্মাকে তিনি প্রবুদ্ধ করেছেন গানে আর কাজে, শিক্ষায় আর সমাজ-সেবায়।

১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তার মাত্র চার বছর আগে ঘটেছে ভারতের শেষ স্বাধীনতা-যুদ্ধ। মারাঠা-মোগলের অন্তিম প্রয়াস মিশেছে ব্যর্থতায়। প্রয়াস ব্যর্থ হলো, কিন্তু তার চিহ্ন রইলো ভারতের শিক্ষিত সমাজের মানসপটে। ভারতের জন্যে ব্রিটিশ শাসন যে কেবল অবিমিশ্র কল্যাণপ্রসূ নয়, একথা অনেকেরই উপলব্ধি হলো।

এই পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠলেন; 'বঙ্গদর্শনে'র যুগ এল, গেল। ১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরীতে প্রবন্ধ পড়লেন 'ইংরেজ ও ভারতবাসী'। অতঃপর 'ইংরেজের আতঙ্ক' এবং 'সুবিচারের অধিকার'। ১৮৯৪ সালে 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্প প্রকাশিত হলো। আমলাতান্ত্রিক অনাচারের কঠোর সমালোচনা আছে এই গল্পে।

তারপর ১৮৯৮ সালে 'কেশরী' পত্রিকায় রাজদ্রোহকর প্রবন্ধ প্রকাশের অজুহাতে লোকমান্য তিলক অভিযুক্ত হলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চাঁদা তুলে দিলেন তিলকের সমর্থনের জন্যে।

রাজনৈতিক ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দারিদ্র্য ও দুঃখ-বিড়ম্বনার জন্যে আমাদের সমাজের দিকেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন, সামাজিক অবস্থা ও অবিচারকেই মূলত দায়ী করেছেন; তাঁর কল্পনায় রাষ্ট্র হলো সমাজেরই বহিঃপ্রকাশ।

১৯০৪ সনে কবি 'স্বদেশী সমাজ' নামে প্রবন্ধ পড়লেন মিনার্ভা থিয়েটারে। কার্জন থিয়েটারে এটি পুনঃপঠিত হলো, রবীন্দ্রনাথ তাতে নব ভারতীয় সমাজের একটা নতুন রূপ দিতে প্রয়াস পেলেন, ইউরোপীয় আদর্শ থেকে যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই প্রসঙ্গে 'স্বদেশী সমাজ' নামে যে ইস্তাহারটি গোপনে বিতরণ করা হয়েছিল, তা থেকে তাঁর তীব্র স্বাদেশিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে। ইস্তাহারটি এখানে সম্পূর্ণভাবে পুনর্মুদ্রিত করা হলো :—

স্বদেশী সমাজ

[পাঠক দয়া করিয়া নিজের অভিপ্রায় মতো এই নিয়মাবলী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করিয়া জোড়াসাঁকোর ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ইহা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁহারা এই কার্যে যোগ দিতে ইচ্ছুক আছেন তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা এই সঙ্গে পাঠাইলে বাধিত হইব।]

আমরা স্থির করিয়াছি আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটি সমাজ স্থাপন করিব।

আমাদের নিজের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাব-মোচন ও কর্তব্যসাধন আমরা নিজে করিব, আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজবিহিত দণ্ড স্বীকার করিব।

সমাজের অধিনায়ক ও তাঁহার সহায়কারী সচিবগণকে তাঁহাদের সমাজ-নির্দিষ্ট অধিকার অনুসারে নির্বিচারে যথাযোগ্য সম্মান করিব।

বাঙালীমাত্রেই এ সমাজে যোগ দিতে পারিবেন।

সাধারণত ২১ বৎসর বয়সের নীচে কাহাকেও গ্রহণ করা হইবে না।

এই সভার সভ্যগণের নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মতি থাকা আবশ্যক।—

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোনো প্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গভর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হইব না।

২। ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না।

৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালীকে ইংরেজিতে পত্র লিখিব না।

৪। ক্রিয়াকর্মে ইংরেজি খানা, ইংরেজি সাজ, ইংরেজি বাদ্য, মদ্য সেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশ্যে ইংরেজ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ নিমন্ত্রণ করি তবে তাহাকে বাংলা রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশীচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনো প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্বাগ্রে সমাজ-নির্দিষ্ট বিচার-ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

৮। পরস্পরের মধ্যে মতান্তর ঘটিলেও বাহিরের লোকের নিকট সমাজের বা সামাজিক নিন্দাজনক কোনো কথা বলিব না।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে, আত্মনির্ভরতা ও চিত্তশুদ্ধিই রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার গোড়ার কথা। এর জন্যে দরকার মনুষ্যত্বের দাবি পেশ করবার শিক্ষা, মাতৃভাষাকে যোগ্য সম্মান দেবার শিক্ষা। যে সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি সেখানে লোকহিতৈষণায় কৃপার ভাবই প্রবল, লৌকিক যোগ অপ্রধান। কিন্তু এই লৌকিক যোগসূত্র স্থাপনা দ্বারাই হয়ে থাকে প্রকৃত দেশাত্মবোধের সৃষ্টি। আত্মনির্ভরতা ও চিত্তশুদ্ধিই তার ভিত্তি। বৈদেশিক শৃঙ্খলমুক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমের পরম ও চরম অবস্থা বলে কোনোদিন মনে

করেন নি। আপনার প্রতি ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করাও তাঁর কাছে খুব বড়ো কথা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা দিলেন। কিন্তু তাঁর এ প্রার্থনা সফল হলো না। অচিরে রাজনীতিতে এলো দলাদলি, ভেদবুদ্ধি, ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস। ভগ্নমনে কবি তখন ফিরে গেলেন শান্তি-নিকেতনের নিশ্চিন্ত কুলায়ে। কিন্তু দেশের কল্যাণের চিন্তা তাঁর মনে রইলো চির-জাগরূক।

তারপর এলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। এ যুগে আমরা কবির কাছে পেয়েছি নেতৃত্ব, পেয়েছি গান। রাখিবন্ধন উৎসবের প্রবর্তন করলেন রবীন্দ্রনাথ। বিপিনচন্দ্র বলেছেন,—"The idea of the Rakhi celebrations, first inaugurated on the 16th October, 1905, the day when the partition was formally effected, as a standing protest against the official attempt to divide the Bengalee race, originated with Rabindranath."

রবীন্দ্রনাথের আবেদন রূপ পেল,—

> বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
> বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
> এক হউক, এক হউক, এক হউক,
> হে ভগবান।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা ভুললে চলবে না যে, কবি তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনা করেছেন। রাজনীতি আকাশ-কুসুম নয়। এ সত্য আমাদের দেশের বহু নেতার অজানা থাকলেও রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। তিনি একস্থানে বলেছেন—"আমার মনে আছে পাবনা কনফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড়ো একজন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি

আমরা সত্য করতে চাই, তা হলে সব আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে। তিনি সে কথাকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না।"

ভারত-ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, "যাহাকে মারি সে যখন ফিরিয়া মারে তখন মানুষের মঙ্গল, যাহাকে মারি সে যখন নীরবে সে-মার মাথা পাতিয়া লয় তখন বড়ো দুর্গতি।…মানুষ যেখানে মানুষকে ঘৃণা করিবার অপ্রতিহত অধিকার পায় সেখানে যে মাদক বিষ তাহার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তেমন নিদারুণ বিষ মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।" এই বিষ থেকে সমকালীন ভারতবর্ষকে মুক্ত করার ব্রত রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী হয়ে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ গোড়া থেকেই তিনি স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে, দেশের উচ্চ-নীচ ভেদ-বৈষম্যই যে-কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে সাফল্য লাভের পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়।

দেশের সাহায্য কবি পাননি, তাই স্বয়ং তিনি পল্লীসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দেশের যে বিরাট একটা অংশ ঘুমন্ত, তাকে উদ্বুদ্ধ করতে নিজেই কাজ শুরু করেছিলেন হাতে-কলমে। তাঁর কাব্যেও তার প্রতিধ্বনি রয়েছে—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

আবার—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ

পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।

আর কী আশ্চর্য, এই আদর্শ তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ম্লান হয়নি! এই সেদিনও তিনি লিখেছেন—

চাষী বসে চালাইছে হাল
তাঁতী বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভার দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

এ হতভাগ্য দেশে এমন কথাও শোনা গেছে যে, রবীন্দ্রনাথ নিছক স্বপ্নবিলাসী। কিন্তু তা নয়। গণশিক্ষার কাজে, পল্লীর কাজে কবি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এর চেয়ে স্বচ্ছ ঐতিহাসিক দৃষ্টি আর কোনো 'গণ-কবি'র আছে বলে জানিনে। যে কবি লিখেছেন,—"চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দু'টো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর। দ্বিতীয়ত, সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।"—তিনি জন্মে অভিজাত হয়েও চিন্তাধর্মে সর্বাংশে জনগণের প্রতিনিধি।

তবে একথা অবশ্য ঠিক রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত রাজনীতিকে কাব্য সাহিত্য বা সংগীতের চেয়ে বেশি গুরুত্ব কোনদিনই দিতে পারেন নি এবং তা দিতে গেলে যে তাঁর 'জাত যাবে' সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সবিশেষ সচেতন। এ বিষয়ে কবির স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে প্রমথ চৌধুরীর কাছে লেখা তাঁর একখানি চিঠিতে। কবি লিখছেন—"মাঝে মাঝে প্রায়ই গান লিখি। যখন লিখি তখন মনে হয় স্বরাজ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর জিনিস নয়—মানুষের

ইতিহাসে অনেক স্বরাজ বুদ্বুদের মতো উঠেছে আর ফেটে গেছে—কিন্তু যে গানগুলোকে দেখতে বুদ্বুদের মতো তা'রা আলোর বুদ্বুদ নক্ষত্রের মতই। সৃষ্টিকর্তার খেলেনাগুলির সঙ্গে তাদের রঙের মিল আছে। সেই জন্যেই যখন তা'রা গড়ে উঠতে থাকে তখন কর্তব্য ভুলে যাই। অথচ দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আসছে যে 'সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখো, লাঠি ধরো'। যদি তা করি তা হলে কর্তারা খুশি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। আমি ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মানতে বসি তা হলে আমার জাত যাবে।"

রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যাতে জড়িয়ে না পড়েন সে বিষয়ে সব সময়ই কবি সতর্ক ছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সেই সতর্কতার প্রমাণ দেওয়া চলে। ঘটনাটি ঘটেছিল মহামান্য তিলক (টিলক)-কে নিয়ে। তিলক মহারাজ তাঁর এক দূত মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে বলেছিলেন ইউরোপ যেতে। কিন্তু কবির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সে বিষয়ে তিনি 'যাত্রী'তে লিখেছেন—"সে সময়ে পোলিটিক্যাল আন্দোলনের তুফান বইচে। আমি বললুম, রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পারব না। তিনি বলে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি এ তাঁর অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। আমি জানতুম জনসাধারণ টিলককে পোলিটিক্যাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারিনি। তারপরে বোম্বাই শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, 'রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন—এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশা করিনি।' আমি

বুঝতে পারলুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন—সে কাজের অধিকার তাঁর ছিল, সেই অধিকার মহৎ অধিকার।"

তা হলেও দুর্জয় সাহস আর অমলিন আত্মসম্মানবোধ রবীন্দ্রনাথ জীবনে একটি দিনও হারাননি। হিজলী বন্দিশালায় যখন বন্দিদ্বয়কে নির্মমভাবে গুলি করা হলো, রবীন্দ্রনাথ তখন মনুমেণ্টের পাদদেশে মহতী সভায় অগ্নিবর্ষী অভিভাষণ দিলেন। আর তাঁর এই নির্ভীকতার রূপ সেদিনও প্রত্যক্ষ করেছি মিস্ র‍্যাথবোনের পত্রের উত্তরে। তাতে তিনি এক জায়গায় বলেছেন—"আমরা যে আজ ইংরেজকে চাই না, তাঁকে অন্তরের ভিতর গ্রহণ করতে পারি না, তা তাঁরা বিদেশী বলে নয়—তার কারণ আমাদের কল্যাণের অভিভাবকত্বের ছলে তাঁরা চরম বিশ্বাসঘাতকতার নজির দেখিয়েছেন। স্বদেশে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির পকেট ভর্তি করবার জন্যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য তাঁরা আহুতিরূপে গ্রহণ করেছেন। আমি ভেবেছিলাম, অন্যায়-অবিচারের পর ভদ্র ইংরেজ অন্তত নীরব থাকবেন—আমাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে আমাদের প্রতি অন্তত কৃতজ্ঞ থাকবেন,—কিন্তু আহতকে অপমান করে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে তাঁরা সৌজন্য ও শালীনতার শেষ সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছেন।" শাসকশ্রেণীর অত্যাচার-অবিচারের প্রতিবাদ এর চেয়ে তীব্র ভাষায় আর কী হতে পারে ?

রাষ্ট্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যা ধারণা সেটা এক হিসাবে হেগেলীয়। হেগেলের মতে রাষ্ট্র বা state হলো "embodiment of the universal idea." রবীন্দ্রনাথ কোনো সৌখীন laissez faire নীতিতে বিশ্বাসী নন, তিনি বরং সমাজের সকল লোককে জড়ো করতে চান এক জায়গায়, যারা আপনার ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন না দিয়েও রাষ্ট্রকল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব যে কেবল Law and order রক্ষা নয়, একথা

রবীন্দ্রনাথ বারংবার উল্লেখ করেছেন, অত বড়ো একজন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়েও। আর রাশিয়া যে তাঁর চিত্তকে এমন বিপুল-ভাবে বিচলিত করেছিল, তার কারণও কতকটা এই।

"রাশিয়া থেকে ফিরে এসে আজ চলেছি আমেরিকার ঘাটে। কিন্তু রাশিয়ার স্মৃতি আজও আমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে। তার প্রধান কারণ, অন্যান্য যে সব দেশে ঘুরেছি তারা সমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেয় না। তাদের নানা কর্মের উদ্যম আছে আপন আপন মহলে। কোথাও আছে পলিটিক্স, কোথাও আছে হাসপাতাল, কোথাও আছে বিশ্ববিদ্যালয়, কোথাও আছে ম্যুজিয়ম—বিশেষজ্ঞেরা তাই নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত করে এক বিরাট দেহ, এক বৃহৎ ব্যক্তিস্বরূপ ধারণ করছে। সব কিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।"

রাষ্ট্রের সব চেয়ে বড়ো দায়িত্ব শিক্ষাবিস্তার। রবীন্দ্রনাথ 'রাশিয়ার চিঠি'তে এ বিষয়ে লিখেছেন—"শিক্ষার বিরাট পর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখিনি, এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা।"

অন্যত্র,—"আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।"

যে ব্রিটিশ-আমলাতন্ত্রের 'রেভিনিয়ু'র একটা বৃহৎ অংশ ব্যয়িত হয় পুলিশের হাতে লাঠি যোগাতে সে যে কেন সুদীর্ঘকাল দেশের জনগণকে রেখেছে অশিক্ষিত করে তার চিন্তা রবীন্দ্রনাথকে শেষদিন পর্যন্ত ব্যথিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, তিনি বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, তাঁর বিশ্বপ্রেমে

ভারতের স্থান সর্বাগ্রেই। স্বদেশী যুগে তিনি 'নববর্ষের দীক্ষা'তে লিখেছেন—

নব বৎসরে করিলাম পণ
লবো স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত, লবো শিক্ষা।
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিবো আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
নব বৎসরে করিলাম পণ
লবো স্বদেশের দীক্ষা।

সুতরাং তাঁর বিশ্বপ্রেম স্বদেশকে বাদ দিয়ে—এমন উক্তি মূঢ়জনেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি ও বিশ্বমানবতাবোধকে যথার্থ ভাবে বুঝতে হলে ভারত সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বাণীটি উপলব্ধি করা দরকার। সে যে বিশ্ববোধ এবং বিশ্বকল্যাণেরই বাণী। আর মূলত সেই বাণী প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই বার বার বিদেশযাত্রী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বিশ্ব-পর্যটন কেবল খুশির ভ্রমণ নয়, একটা সংকল্পের জয়যাত্রা। তিনি যে আদর্শের প্রচারক তা কোনো গোপন আধ্যাত্মিকতার বিষয় নয়, হিংসার বিরুদ্ধে মানবতার উদ্বোধনে তা ধন্য। বিভেদের দ্বন্দ্বকে প্রেমের মধুর সঙ্গীতে তিনি ডুবিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সমগ্র মানবজাতিকে এক মিলনসভাতলে মিলিত হবার জন্যে তিনি আহ্বান জানালেন তাঁর অজস্র লেখায়, তাঁর অসংখ্য বক্তৃতায়। যুদ্ধ আর হানাহানির বিরুদ্ধে ধ্বনিত হতে থাকলো তাঁর তীব্র প্রতিবাদ। এই মানবপ্রেমই বিশ্ববাসীর হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিরকালের মতো বরেণ্য করে রেখেছে।

১৯১৬ সালে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'Message of India to Japan' এবং 'Spirit of Japan' নামে যে দু'টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার মানব-দরদী সুর সেদিন সারা বিশ্বের সুধী-সমাজে পরম শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল। এ দু'টি বক্তৃতা পড়েই পাশ্চাত্যের মহামনীষী রোমাঁ রোলাঁ তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

তারপরে রটারডাম গীর্জার বেদী থেকে তাঁর বাণী 'The Message of the East', অক্সফোর্ডে তাঁর বক্তৃতা 'Religion of Man', আমেরিকায় তাঁর ভাষণ 'Personality' যুদ্ধ-শংকিত পৃথিবীর কাছে নতুন জীবন-বেদ বলেই মনে হয়েছিল। 'নতুন পৃথিবী' সেদিন কবির পরিচয় বর্ণনায় বলেছিল—"An alien prophetic figure whose presence puts a breath of oriental mysticism into discordant occident." আর সোভিয়েট সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক পেট্রফ মস্কোয় সম্বর্ধনা ভাষণে রবীন্দ্রনাথকে শুধু কবি বা দ্রষ্টা নয়, 'পৃথিবীর জনসাধারণকে মানুষ হবার শিক্ষাদানে অগ্রণী, দক্ষ শিক্ষক···এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রকৃষ্ট অগ্রদূত' বলে অভিহিত করেছিলেন।

এককালে ইউরোপ তথা সারা পৃথিবীতেই রবীন্দ্রনাথকে দৈব আবির্ভাবের মতো মনে হয়েছিল; তাঁর কথাকে মনে হতো দৈববাণী বলে। যে পরম শ্রদ্ধার ওপর এই বিমুগ্ধ বিস্ময়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা কোনোদিনই লুপ্ত হবার নয়।

তবে এসব বর্ণনার পরেও একটি বিষয় সূর্যালোকের মতোই স্পষ্ট থেকে যায় এবং তা হলো এই যে, বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লোকে দেশপ্রেমের প্রদীপশিখা ছিল চির-অনির্বাণ।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের আত্মাকে নমস্কার জানিয়েছেন—

············যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই ক্ষুদ্র খণ্ড করি।

ভারতের তপোবন কবির ভালো লেগেছে—ভালো লেগেছে বাংলার মাধুর্য। তাই বলেছেন—

নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি !

কবির স্বদেশপ্রেমে এতটুকু সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষকে মানুষের অধিকার দিতে হলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে কৃত্রিম পার্থক্যের প্রাচীর আছে, তা তুলে দিতে হবে। 'বিশ্বমানবতা' বলে রবীন্দ্রনাথের যদি কিছু থাকে তবে তা এই।

রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, "যে বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্ছে শুভবুদ্ধি।" তাই তাঁর কথা, "আমাদের দেশে জাতীয় কোন প্রচেষ্টার মধ্যে যদি সর্বজনীন কোন বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে।" সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে সর্বপ্রকার দীনতামুক্ত দেশপ্রেমই ছিল কবির প্রত্যাশিত।

এই জন্যেই কবি বলেছিলেন যে, মাতৃভূমি ভারতবর্ষের অভিষেক উৎসব হবে—

সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।

সব বিতর্কের অবসানে একথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথ এদেশকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিলেন। ভারতের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা তার পরিচয় আছে সুদূর থেকে লেখা পত্রাবলীতে। দক্ষিণ আমেরিকায় বসেও তিনি কবিতা রচনা করেছেন ভারতীয় ফুল আকন্দ নিয়ে। জাতীয় আন্দোলনে তিনি ছিলেন পুরোহিত—"If Surendra Nath Banerjee represented the practical side, and Bipin Chandra Pal and Arabindo Ghose the passionate side, Rabindra

Nath Tagore incarnated the ideal side of Indian nationalism." সত্যাগ্রহের আভাস তিনিই প্রথম সূচিত করেন 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে, আর অস্পৃশ্যতা আন্দোলনের কল্পনাও যখন অনেকের মনে ছিল না, কবি তখনই উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর সাবধানবাণী,—

> হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা

"আমার তো মনে হয় আমার কাব্য রচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।"—জীবনস্মৃতি।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র-কাব্যের কোনো উপযুক্ত বা বিস্তৃত আলোচনা করবার ক্ষেত্র এটা নয়। আমরা এখানে তাঁর কাব্যের মূলসূত্রটি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবো।

রবীন্দ্র-কাব্যের মূলসূত্র আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, তাঁর কাব্যে তথাকথিত কোনো 'মূলসূত্র'ই নেই। কোনও বিশেষ একটি রীতিকে কেন্দ্র করে তাঁর কাব্য গড়ে ওঠে নি, উঠলে তা নিষ্প্রাণ হতো। গতি এবং বেগ, প্রাণ এবং পরিবর্তন—রবীন্দ্র-কাব্যের বৈশিষ্ট্যই এখানে। উপমার আশ্রয় নিলে বলা যায়, কবির প্রতিভা একটা নির্ঝরের মতো; প্রথমে তার 'স্বপ্নভঙ্গ', তারপর রুক্ষ উপলের বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে অগ্রসর হয়ে যাওয়া। পদে পদে তা'র স্রোত ফিরেছে ঘুরেছে, বৈচিত্র্যে উঠেছে আকুল হয়ে। রবীন্দ্র-কাব্যের এইটেই প্রাণধর্ম,—একে বলা যায় Dynamic.

বাঙলাদেশে এক সময় সাধারণ শিক্ষিত সমাজে এমন একটা মনোভাব দেখা দিয়েছিল যখন কল্পনা-বিলাস, বিশ্বপ্রীতির আতিশয্য-দোষে রবীন্দ্র-কাব্যকে ততটা সম্প্রীতির চোখে দেখা হতো না। কালক্রমে বাঙালীর সে ভুল ভেঙেছে। একথা অবশ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, রবীন্দ্রকাব্যে একটা সর্বজনীন সুর প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান, কিন্তু স্বদেশেরই আবহাওয়ায় সে সুরের উন্মেষ। বিশ্বপ্রেমের খাতিরে রবীন্দ্র-কাব্যলোকে স্বজাতীয় মানসকে কখনও অস্বীকৃত বা অবজ্ঞাত হতে দেখা যায় নি।

এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের ধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। বৈষ্ণব কাব্যেরও সর্বত্র সীমার মধ্যে অসীমকে পাওয়ার ব্যাকুলতা স্পষ্ট। তাঁর বাল্যকালের 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে' ঘরের বার হওয়া ছিল নিষেধ। তখন খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বালক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে নিয়েছিলেন। ব্যবধানই দু'জনকে এনেছিল কাছাকাছি। বাইরে ছড়ানো এই যে রূপরসস্পর্শময় পৃথিবী, এরি জন্যে তাঁর কবি-হৃদয়ে ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই তিনি অসীমের সন্ধান পেয়েছিলেন।

কালক্রমে খড়খড়ির গণ্ডী ঘুচেছে, কিন্তু মনের গণ্ডী তবু ঘোচেনি। বিশ্বপ্রকৃতিকে তিনি আপন করে নিতে পারেননি। তাঁর কিশোর বয়সের সব কবিতার মধ্যেই এই একটি অপূর্ণতা ও অতৃপ্তির সুর ধ্বনিত।—

> প্রাণের সমুদ্র যেন আছে এক এ দেহ মাঝারে,
> মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে।
> মনের এ রুদ্ধ স্রোত দেহখানা করি' বিদারিত,
> সমস্ত জগৎ যেন চাহে সখী করিতে প্লাবিত।

এই কামনাই কিছুকাল পরে আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। 'প্রভাত উৎসব' কবিতাটিতে। কবি বলছেন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

* * * *

আকাশ, এস এস, ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি তো তোরি বুকে আমি ত হেথা নাই।

পরবর্তীকালেও এই ব্যাকুলতা—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

কিংবা

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।

এবং

অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা।

'প্রভাত সঙ্গীতে'র পূর্বেকার যে যুগ, তাকে বলা হয়ে থাকে 'হৃদয় অরণ্য', কারণ তখন অসীম থেকে কবি বিচ্ছিন্ন ছিলেন, স্বপ্নে ছিলেন অভিভূত। 'প্রভাত সঙ্গীতে' তাঁর দৃষ্টির প্রথম উন্মেষ। প্রকৃতির স্রোতে কবি নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন একটা অসংযত উচ্ছ্বাসে—

তপন ভাসে তারা ভাসে আমিও যাই ভেসে
তাদের গানে আমার গান যেতেছে এক দেশে।

তিনি আবিষ্কার করলেন—

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আধা
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা॥

তারপর দেখলেন—

ডাকে যেন ডাকে যেন, সিন্ধু মোরে ডাকে যেন।

কবির 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'ও অসীমের উদ্দেশে—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরি,
বলো কোন পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?

'খাঁচার পাখী আর বনের পাখী' তুলনাটিতেও সীমার আর অসীমের সম্বন্ধ-বিশ্লেষণ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছা-বিহারপ্রিয় পুরুষ এবং গৃহবাসিনী অবরুদ্ধা রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে।...একজন বনের পাখী, আর একজন খাঁচার পাখী। এই খাঁচার পাখীটাই বেশি করিয়া গান গাহে, কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্যে একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধভাবে ও বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ হইয়া থাকে।"

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র প্রশ্ন 'মানস সুন্দরী'তেও—

কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি?

'বসুন্ধরা' কবিতাতে কবি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দেবার আগ্রহই প্রকাশ করেছেন।

ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই।
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো।

কবি রবীন্দ্রনাথের মন কোনো বিশেষ ঘাটে বাঁধা পড়েনি। পরিবর্তন এবং যাত্রাই তার মূলসূত্র এবং পাথেয় বোধ করি একমাত্র 'জিজ্ঞাসা'।

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি' অন্তরে মম ?

এই প্রশ্ন ঘোচেনি শেষদিন পর্যন্ত এবং সমগ্র কাব্যপ্রবাহের মধ্যে এই জিজ্ঞাসাই বারবার আপনাকে প্রকাশ করেছে, এই সংশয়ের রূপবৈচিত্র্যেই রবীন্দ্র-কাব্যের ডালি পরিপূর্ণ। সংশয় এনে দিয়েছে সন্ধান, বারংবার এক ভাব থেকে ভাবান্তরে, এক অনুভূতিকে আশ্রয় করে অন্য অনুভূতিতে তাঁর কাব্য পোঁছেচে।

কোনও সুনির্দিষ্ট পরিণতি কবি সমস্ত জীবনেও লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ, কাব্যের promised land-এ তিনি কোনোদিন পোঁছতে পারেন নি। "এই যে বন্ধন ও মুক্তি, মুক্তি ও বন্ধন, আমি আগেই বলিয়াছি, এর কোনও পরিণতি নাই, ক্রমাগত পরিবর্তনই এর পরিণতি। কবি নিজেও তাহা জানেন, তিনি জানেন তাঁহার এই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কোথাও শেষ হইবার নয়, শুধু পথ চলাতেই তাহার আনন্দ। কী আছে হোথায়, চলেছি কিসের অন্বেষণে ? রবীন্দ্র কাব্যে এই প্রশ্নও অশেষ, ইহার উত্তরও অশেষ। বস্তুতঃ রবীন্দ্র কবি-জীবনের যাহা ধর্ম, তাহাতে এ প্রশ্নের কখনও শেষ হইতে পারে না, ···।"

রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবন যে পরিবর্তনের ইতিহাসের অনুসারী, তাকে অনেকগুলি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে এক থেকে অপরকে আলাদা করে করে দেখানো সম্ভব। সৃষ্টি-বিবর্তনের মতো তাঁর কবি-জীবনও এক ধীর ও নিশ্চিত নিয়মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে মহাদেশের মতো। 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' থেকে 'প্রভাত সঙ্গীতে'র যুগ পর্যন্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির পরিচয় ক্রমশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। একটা অস্বচ্ছভাব, অনুভূতির একটা দুর্বলতা এ যুগের কবিতায় স্পষ্ট। পরবর্তী যুগের শুরু 'ছবি ও গান' দিয়ে, 'চিত্রাঙ্গদা'য় তার সমাপ্তি।

সাহিত্যের সত্য পরিচয় রূপে ও রসে। এই রূপ এবং রসেরই প্রতিচ্ছবি রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গীতিকাব্য 'ছবি ও গান'-এর নামকরণে। এই নামকরণ প্রসঙ্গে কবি পরে একসময় বলেছেন—"বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলেম 'ছবি ও গান'। ভেবে দেখলে দেখা যাবে এ দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়।" কবি-পরিণয়ের (১৮৮৩) মাত্র তিন মাস পরে মুদ্রিত এই কাব্য-গ্রন্থখানিও যে বৌঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবীকেই উৎসর্গ করা হয়েছে কোথাও তাঁর নামোল্লেখ না থাকলেও নিবেদন-পত্রের ভাষা থেকেই তা ধরে নেওয়া চলে। "গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।"—এই উৎসর্গ-মন্তব্যে এও স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, কাদম্বরী দেবী ছিলেন কবির প্রথম জীবনের রচনাবলীর এক প্রেরণা-উৎস।

"নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই 'ছবি ও গান'-এ আরম্ভ হইয়াছে।"—বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে এক স্বীকৃতি প্রকাশ করেছেন। তারপর থেকেই লক্ষ্য করা যায় প্রকৃতির বাস্তবরূপ ও স্বপ্নরূপের মধ্যে এ সময় কবিজীবনে চলেছে খেয়া পারাপার। এরি মধ্যে আছে 'কড়ি ও কোমল'—নবযৌবনের রক্ত-চাঞ্চল্যে ভরপূর—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' কিন্তু দেহকে দেহের জন্যেই এখানে কামনা করা হয়নি। দেহের মধ্যে দেহাতীতের উপলব্ধির যে রোমান্টিক মাধুর্য তা 'কড়ি ও কোমলে' বিদ্যমান।

'মানসী'তে বিশেষ একটা রূপের সন্ধান পাওয়া গেল, যা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। এতকাল মহাসমুদ্রের মধ্যে কেবল দেশই গড়ে উঠছিল, এইবার ফসলের চাষও হলো শুরু।

বৃথা এ ক্রন্দন।
হায়রে দুরাশা,
এ রহস্য এ আনন্দ তোর তরে নয়।

কবি-হৃদয়ের এই অতৃপ্তি, শেলীসুলভ এই যে রোমান্টিসিজম, 'মানসী'র কবিতাগুলিতে এ ধ্বনি সুস্পষ্ট। এই কাব্যে দেখা যায়, দৈহিক প্রেমে কবির বাসনা পরিতৃপ্ত হয় নি! তিনি ক্রমাগত প্রেমের উপলব্ধির জন্য ব্যাকুল।

'মানসী'র পর 'চিত্রাঙ্গদা'। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে কবি দেহজ প্রেমকে আরো অকিঞ্চিৎকর বলে জ্ঞান করেছেন, এমন কি তাকে প্রকৃত আন্তরিক মিলনের অন্তরায় বলেই বর্ণনা করেছেন। আপনার রূপকে 'সপত্নী' কল্পনা করে নিয়ে চিত্রাঙ্গদা আক্ষেপোক্তি করছে—

হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী।

দেহাতীতকে লাভ করবার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার আরো পরিণতি ঘটলো 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'তে 'জীবনদেবতা' রহস্য আরো ঘন হয়ে উঠেছে, কিন্তু নিসর্গের সঙ্গে কবিমানসের যে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ তা এ যুগে আরো সার্থক। আঙ্গিক, শব্দবিন্যাস প্রভৃতির দিক দিয়ে এ যুগ রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে মধ্যাহ্নের মতো জ্যোতির্ময়। প্রশ্ন এ যুগে হয়ত আছে; হয়ত কেন, যথেষ্ট আছে, কিন্তু ধীরে ধীরে কবি যে বিরাট একটি সাফল্য অর্জন করেছেন, তাঁর কাব্য যে সমসাময়িক কালের মোসাহেবি করেই নিরুদ্বেগে মৃত্যুবরণ করে নেবে না, এ সম্বন্ধে একটা দৃঢ় ধারণা কবির মনে জেগেছে; '১৪০০ সালে' কবিতাটিতে তারই পরিচয় লিপিবদ্ধ—

আমার বসন্তগান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয় স্পন্দনে তব, ভ্রমর গুঞ্জনে নব,
পল্লব-মর্মরে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

এই সার্থকতার অনুভূতি একটা দ্যুতিমান পরিণতি লাভ করেছে 'চৈতালি'র কবিতায়। এখানে কবিতার পর কবিতায় আমরা পাই মমতাভরা দৃষ্টিতে সারা বিশ্বকে কবির উপভোগ করবার আগ্রহ। কবির ধারণা তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত, এবার 'হেলা ফেলা সারা বেলা'। নির্জন ঘাটে কলসীতে জল ভরার দৃশ্য দেখা, কিংবা ছোট ছোট সনেটে (?) আপনার ছোট ছোট ভাবগুলিকে রূপ দিলেই যথেষ্ট।

শুক্তি রক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেল বৃন্তগুলি,
সুখাবেশে বসি' লতামূলে
সারা বেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথাকাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহ তুলি' তুলি'
তব ওষ্ঠ দশন দংশনে
টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।

এর উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন।

এই পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ জিনিষও কবির চোখে মধুময় মনে হতে লাগল—

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়।
সকলি দুর্লভ বলি আজি মনে হয়।

প্রকৃতির প্রতি এই যে গভীর অনুরাগ কবি-জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা ছিল অটুট অব্যাহত। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে কবির

একটি গানের কলি—"আমার মনকে বেঁধেছে রে এই ধরণীর মাটির বাঁধন।" এই মাটির পৃথিবীর মহিমা গেয়ে তিনি 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় লিখেছেন—

মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে
সে যে মাতৃভূমি, তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু'দিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু'দণ্ডের তরে।
স্বর্গে তব বহুক অমৃত
মর্ত্যে থাক সুখদুঃখে অনন্তমিশ্রিত
প্রেমধারা, অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

তারপর অন্যত্র রাত্রির অবসানে উষালোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—

আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।

প্রকৃতির মধ্যে কবির এই যে গভীর আনন্দ ও বিস্ময়বোধ তার কারণ বর্ণনায় তিনি বলেছেন—"এই তৃণগুল্মলতা, জলধারা, বায়ু-প্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্তন, জ্যোতিষ্ক দলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণিপর্যায় এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীচলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো, তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়েছে, সেখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে। জগতের অণুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হতো, যদি প্রাণে ও আনন্দে অনন্ত দেশকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত, তাহলে কখনই এই বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হতো না।"

নাগরিক পরিবেশের মধ্যে কবির জন্ম, তা সত্ত্বেও এই কপট ও কৃত্রিম নাগরিক জীবনের উপর তাঁর ছিল একটা আজন্ম বিতৃষ্ণা। বাতায়ন-পথে, আঁধারে-আলোকে, আকাশে-বাতাসে প্রকৃতির যে

সামান্য আভাস ইঙ্গিত শিশু-রবির মনকে উন্মনা করে তুলেছিল পরবর্তী জীবনে সে ইঙ্গিতেরই দুর্দম আকর্ষণে নাগরিক আবহাওয়া অসহ্য মনে হয়েছে তাঁর কাছে। তাই তাঁর মতে—

দ্বেষ হিংসা কুৎসার কলুষে
আলোহীন অন্তরের গুহাতলে যেথা রাখে পুষে
ইতরের অহংকার।
স্বাস্থ্যহীন বীর্যহীন যে হীনতা ধ্বংসের বাহন
গর্তখোদা ক্রিমিগণ তারি অনুচর।
অতি ক্ষুদ্র তাই তারা অতি ভয়ংকর
অগোচরে আনে মহামারী
শনির কলির দত্ত সর্বনাশ তারি।
এর চেয়ে আরণ্যক তীব্র হিংসা সেও
শতগুণে শ্রেয়।

এর পর যে অলস বেলা, কবি তখন রচনা করলেন 'কথা ও কাহিনী', যা রচনার প্রেরণা নেওয়া হলো প্রধানত ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক প্রচলিত গল্প থেকে। এরই সঙ্গে 'কণিকা'। বোঝা যায়, যে পরিবর্তনকে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রাণ বলে ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, তার ধারা এই যুগে বাস্তবিকই ক্ষীণ হয়ে আসছিল,—অতৃপ্তির রোমান্টিক প্রেরণা কবি-মানসকে এ যুগে বিকল করেনি। কিন্তু এরি পরে এলো 'কল্পনা'। পরিবর্তন নয়, 'চিত্রা'রই পরিণতি। প্রকৃতির সঙ্গে কবি এযুগে একেবারেই একান্ত হয়ে উঠেছেন, কোনও স্থানে অবকাশ নেই, বিচ্ছেদ নেই। 'দুঃসময়', 'বর্ষামঙ্গল', 'বর্ষশেষ', 'বৈশাখ' প্রভৃতি কবিতা 'কল্পনা'র। 'কল্পনা'তে পুরানো যুগের অবসান, কবির জীবনে নতুন একটি রাত্রি প্রভাতোন্মুখ। কবি সেই নতুনকেই প্রণতি জানিয়েছেন—

হে নূতন এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে

ব্যাপ্ত করি' লুপ্ত করি' স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোর স্তূপে।

* * *

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ সুস্নিগ্ধ শ্যামল
অক্লান্ত অম্লান।
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জানো।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জলদর্চিরেখা
করজোড়ে চেয়ে আছি উর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানিনা
কী তাহাতে লেখা।

"এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল!" যে শান্তির ক্রোড়ে কবি কিছুকাল বিশ্রাম করছিলেন, বর্ষশেষের ঝড়ে তার সমাপন হলো। কবি নতুনের জন্যে আসন পাতলেন। "এম্‌নি ভাবে, চিরনবীন যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে।"

এর পরবর্তী যুগের সূত্রপাত—'নৈবেদ্যে'। কিন্তু এরি মাঝখানে রয়েছে 'ক্ষণিকা'।

'ক্ষণিকা' ক্ষণকালের কাব্য। জীবনের কোনো গভীর দর্শন এতে নেই, বিরাট কোনো অনুভূতির ডমরু এখানে বাজেনি। 'ক্ষণিকা'য় সহজ দেখা, ক্ষণকালের ছবি, অপরূপ ছন্দের বন্ধনে বন্দী। 'ক্ষণিকা'র কবি 'ময়নাপাড়ার মাঠে' দেখা 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ' দেখে মুগ্ধ, শুধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান গেয়েছেন ক্ষণিক দিনের আলোকে। বলছেন—

হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি
ছুটিনে কাহারো পিছুতে
মন নাহি মোর কিছুতেই নাই কিছুতে।

'ক্ষণিকা'য় বিরাট একটা সাধনার সূত্রপাত! পালকির ফাঁক দিয়ে নববধূর শেষবারের মতো আম-জামের বাগানে সকাতর চোখ বুলিয়ে নেবার মতো।

এরি পরে 'নৈবেদ্য'। যৌবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার ঢেউ অতিক্রম করে অধ্যাত্মজীবনের দ্বার-প্রান্তে এসে পৌঁছেচেন কবি। উপনিষদের বাণী নতুনরূপে প্রকাশ পেয়েছে এই কাব্যের বিভিন্ন আপাত সনেটরূপী কবিতায়। কিন্তু এই অধ্যাত্মসাধনায় কবি সংসারকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলবার আবশ্যক বোধ করেন নি। যৌবনের 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' আর অস্তমিত যৌবনের 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু বয়সের। 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে' কবি 'মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ' লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন। বৈষ্ণবী ক্ষমার ভাব এ সব প্রার্থনায় নেই, দৃপ্ত কণ্ঠে কবি বলেছেন—

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

এরই পরে 'স্মরণ', 'শিশু', 'খেয়া' প্রভৃতি।

'স্মরণ' কাব্যের রচনা কবির স্ত্রীবিয়োগের পর। প্রিয়তমার বিচ্ছেদ-বেদনা মৃত্যুসম্পর্কিত কয়েকটি কবিতায় স্থায়ী আসন লাভ করেছে এই কাব্যে। মৃত্যুর সান্নিধ্যে এসে তার বিভীষিকাও কবি-মন থেকে হয়েছে দূর, কবি তাই সহজ প্রসন্ন চিত্তে বলতে পেরেছেন—

তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।

'শিশু'র কবিতার উৎসও ব্যক্তিগত, কিন্তু এর মধ্যেও একটা রহস্যের আভাস আছে। "শিশুকে তিনি দেখিতেছেন বিশ্বজীবনের একটি খণ্ড অংশ রূপে…। 'শিশু'র কবিতা শিশুর মুখের কথাও নয়, শিশুর মনের কথাও নয়, শিশুকে আশ্রয় করিয়া বাৎসল্য-রস রহস্য-রস যাহার মধ্যে মূর্তি লইয়াছে, তাহার মুখের কথা, মনের

কথা। শিশুর যাহা সহজ খেয়াল মাত্র সেইখানে জাগিয়াছে কবির মনে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা…।”

‘খেয়া’র প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই বিষণ্ণতার ছাপ। একটা অবর্ণনীয় নৈরাশ্যের অনুভূতিতে কবির হৃদয় ভারাক্রান্ত।

ঘরে যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর পানে ;
পারে যারা যাবার গেছে পারে।

কবি ঘরেও নন, পারেও নন,—মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মতো উৎকণ্ঠিত অনিশ্চিতিতে দোদুল্যমান, ‘খেয়া’ তরীর আশায় ঘাটে এসে বসেছেন। এই যে অনুভূতি, এ ‘খেয়া’র প্রায় সব কবিতাতেই আছে। ‘ত্যাগ’ কবিতাটিতেও—

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা,
আমি কী দিলেম তারে জানে না সে কেউ
ধূলায় রহিল ঢাকা।

কিংবা,—

নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি
কখন যে গেছ বিহানে
তাহা কে জানে!

এই নৈরাশ্যের বশেই কবি বলছেন—

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।

‘সব পেয়েছির দেশ’ ‘খেয়া’র যুগেও utopia মাত্র। কবি বলেছেন বটে—

ওরে কবি এইখানে তোর কুটীরখানি তোল্।

কিন্তু কুটীর তোলাই সার, সেখানে বিশ্রাম কবির ভাগ্যে লেখা

নেই। অতএব পরিবর্তনের স্রোতে কবিকে আবার ভেসে পড়তে হয়েছে।

এই পরিবর্তন সম্বন্ধে কবির নিজেরও একটা উপলব্ধি ছিল। ১৮৯৯ সালের মে মাসে বীরবলকে লিখিত একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে তাঁর ভাবক্ষেত্রে পরিবর্তনজনিত অস্থিরতা এবং একটা সুগভীর আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ করেছেন। সে পত্রে তিনি লিখছেন—"আজকাল যে সকল কবিতা লিখছি, তা 'ছবি ও গান' থেকে এত তফাৎ যে আমি ভাবি যে আমার লেখার আর কোথাও পরিণতি হচ্ছে না, ক্রমাগতই পরিবর্তন চলছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারছি, আমি যেন আর-একটা পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এরকম অবস্থায় কতকাল চলবে তাই ভাবি। অবশেষে একটা জায়গা তো পাব, যেটা বিশেষরূপে আমারই জায়গা। অবিশ্রাম পরিবর্তন দেখলে ভয় হয় যে, এতকাল ধ'রে এতগুলো যে লিখলুম, সেগুলো কিছুই হয়তো টিকবে না—আমার নিজের যেটা চরম অভিব্যক্তি সেটা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এগুলো কেবল ভাবে আছে। বাস্তবিক, কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে, কবে যে ধরা পড়বে তার ঠিক নেই। কিন্তু আমি দেখছি, যদিও এক এক সময়ে সন্দেহের অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়, এবং আমার পুরাতন সমস্ত লেখার উপরেই অবিশ্বাস জন্মে, তবু মোটের উপর মন থেকে এই আত্মবিশ্বাসটুকু যায় না যে, যদি যথেষ্টকাল বেঁচে থাকি, তা হ'লে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে গিয়ে পৌঁছব, সেখান থেকে কেউ আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না।"

দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে স্থায়ী আসন লাভ করলেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ধারা নিত্য নতুন পরিবর্তিত পথেই প্রবাহিত হয়ে চলেছে—কোথাও তা নিশ্চিত পরিণতি লাভ করেছে এ কথা কেউ বলতে পারে না।

'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্যে'র যুগে কবির মানসরূপের একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। 'চিত্রা'-'কল্পনা'র সেই বাক্যচ্ছটা স্তিমিত ; সেই উল্লাস অবসিত। বিজয়ী সম্রাট যেন আট ঘোড়ার গাড়িতে সমারোহের সঙ্গে মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে পোঁছে, নগ্নপদে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেবতাকে অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। তাঁর সাজ নেই, অলঙ্কার নেই, বাহুল্য নেই। 'গীতাঞ্জলি'তে তাই রসের কথার চেয়ে সাধনার কথা বড়ো, "আনন্দ অপেক্ষা বেদনার কথা অধিক।" সম্রাট এখানে সব-হারানোর দলে নেমে এসেছেন,—যারা মাটি ভেঙে চাষ করছে, আর পাথর ভেঙে পথ কাটছে, তাদের মধ্যে কবি অন্বেষণ করছেন ভগবানকে। 'গীতাঞ্জলি'তে ভগবানকে অনায়াসে লাভ করার স্বপ্ন আছে, সমারোহকে নির্বাসিত করে।—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে,
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

অধীর প্রতীক্ষায় 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা ক্রন্দনাকুল—

আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি', হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার!

এরই পাশাপাশি আছে আশার পদধ্বনি—

তোরা শুনিস্‌নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে, আসে, আসে।

এই সাধনাই 'গীতিমাল্য'তে পূর্ণতা পেয়েছে—

কোলাহল তো বারণ হলো
এবার কথা কানে কানে,
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবল মাত্র গানে গানে।

এরই পরেই কাব্যসৃষ্টির একটা নতুন অধ্যায় খুলে গেল। সে কাব্যটির নাম 'বলাকা'। সুদূরের পিয়াসী রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্যই তাঁকে আবার নতুন ধর্মে দীক্ষা দিল, এ ধর্ম গতির, বেগের। স্থাণু বলে কিছু নেই, গতিই সত্য। এই বিশ্বের অগণিত বস্তুকণিকার মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহ, তা গতিশীল। বার্গসঁর দর্শনের সঙ্গে 'বলাকা'র এই ধর্মের মিল অনেকখানি। এই তত্ত্বের একটা সম্পূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন রূপ পাই 'বলাকা' কবিতায়। ঝিলম নদীর উপর বসে কবি সন্ধ্যার অন্ধকারে এক ঝাঁক হংস-বলাকাকে উড়ে যেতে দেখলেন। অমনি তাঁর কবিচিত্তে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়ে উঠলো। কবির মনে হলো—

পর্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি',
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দ-রেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

সর্বত্রই পাখার শব্দ, শূন্যে, জলে, স্থলে পাখার শব্দ একটানা বয়ে চলেছে। গতির নেশায় আপাতজড় পদার্থগুলি চঞ্চল। এরি সঙ্গে—

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।

* * * *

ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।

এই অতৃপ্তি, এই অপূর্ণ থেকে পূর্ণে, পূর্ণ থেকে পূর্ণতরে, এক পরিণতি থেকে অন্য পরিণতিতে অভিসারই 'বলাকা'র মূলসূত্র। 'চঞ্চলা' কবিতাতেও—

নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর ওঠে রণরণি',
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা।
মনে পড়ে সেই কথা,—

যুগে যুগে তিনি এসেছেন রূপ থেকে রূপে, প্রাণ থেকে প্রাণে, গান থেকে গানে। এ চলার আদি নেই, অন্ত নেই, প্রবাহ-ই এর পাথেয়।

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে
তাকাস্নে ফিরে
সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি'
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে, অকূল আলোতে।

'শাহজাহান' কবিতাতেও,—

তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন বিহীন

অথবা,

প্রিয়া তারে রাখিল না রাজ্য তারে
ছেড়ে দিল পথ
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।

আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।

'বলাকা'র পর 'পলাতকা', তার পর 'পূরবী'। 'পূরবী'র কবি জীবনের দিকে পিছন ফিরে চাইছেন। এই দীর্ঘ দিনের যাত্রাপথে কত অগণিত মানুষ, কত ফুল পাখী তাঁর জীবনে এসেছে, সেই যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল দিনগুলো কোথায় গেল? সমাহিত চিত্তের সন্ধানে কবি তার উত্তরও পেয়েছেন, তারা হারায়নি।

নহে নহে আছে তারা, নিয়েছ তাদের সংহরিয়া,
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখো সঙ্গোপনে।

কবি জানেন এই শেষ নয়, যৌবনের অবসান ইতিহাসের সওয়াল জবাব নয়।

বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসন নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে
আমি রচি তারি সিংহাসন।

কবি জানেন তাঁর শেষপূজা সাঙ্গ হয়নি।

জানি, জানি, আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি
সন্ধ্যারতি লগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিণী?

তাঁর সংশয় আছে এখনো।

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হ'ল তুলে,
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে?

রবীন্দ্র কবি-মানসে রঙের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ‘পূরবী’ যুগ পর্যন্ত বিশেষভাবে নীল ও শ্যামলের প্রতি কবির গভীর আকর্ষণ লক্ষ্য করা গেলেও তাঁর পরবর্তী কালের রচনায় নানা রঙের ভীড়ই চোখে পড়ে। যে কবি ‘ছবি’ কবিতায় লিখেছেন—

নয়ন সমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই!
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।

অথবা শারদীয় বাঙলার বর্ণনায়ও শুধুমাত্র নীল আর শ্যামলে বিমোহিত হয়েই যিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে গেয়ে উঠলেন—

তুলি’ মেঘভার আকাশে তোমার
করেছ সুনীল-ধরণী
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।

সেই কবিকেই ‘মহুয়া’র পর্বে দেখি তিনি যেন রঙের প্রায় সাত সমুদ্রেই অবগাহন করে চলেছেন।

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে
ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।

রঙের প্রতি কবির এ ধরণের আকর্ষণবোধকে রোমন্টিকতাদুষ্ট বলে কেউ কেউ কটাক্ষ করলেও এ যে প্রকৃত জীবনশিল্পীরই পরিচায়ক এ স্বীকার করতেই হবে।

‘পূরবী’র পরেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহের ধারা একটুও শীর্ণ হয়নি। ‘মহুয়া’তে তিনি আবার ফিরে পেয়েছেন সেই যৌবনের

'ক্ষণিকা'র ভাব। নরনারীর সহজ প্রেমের সৌন্দর্য তিনি উপলব্ধি করেছেন, তাই বলতে পেরেছেন,—

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দু'জন চল্‌তি হাওয়ার পন্থী।

'মহুয়া'র ধারা বয়ে এসেছে 'বনবাণী', 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ'। 'পুনশ্চ'তে কবি কাব্যে গদ্যছন্দের প্রবর্তন করলেন। 'পুনশ্চ'ই শেষ নয়,—পরে আরো আছে। এমন কি, শেষ রোগশয্যাতেও তিনি দু'খানা বই লিখেছেন। তাতে দেখি তাঁর পরিবর্তনশীল মন তখনো সজীব। জরা এসেছে শুধু দেহে। মন আগের মতোই সবুজ এবং অবুঝ। কুৎসিত স্বার্থের হানাহানিতে ইতিহাস কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু কবির প্রত্যাশার শেষ নেই। তিনি জানেন এ পাপযুগের অন্ত হবে—

আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

আর সেই সৃষ্টির আহ্বানের মৃতসঞ্জীবনীতে কারা জেগে উঠবে? কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন।—
যারা চিরকাল—

টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে
*　　*　　*
দেশ দেশান্তরে
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে
পঞ্জাবে বম্বাই গুজরাটে।
*　　*　　*
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে।

এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী কোনও প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী কবিরও আছে বলে আমাদের জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্রষ্টা। তাঁর কীর্তির চেয়ে তিনি মহৎ। প্রতি ঘাটেই তিনি তরী বেঁধেছেন, কিন্তু প্রাণময় চঞ্চলতা তাঁকে বিশ্রাম করতে দেয় নি, বারংবার তরীর বাঁধন খুলে তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হয়ে পড়েছেন,—উচ্চ কণ্ঠে বলেছেন—

হেথা নয়, হেথা নয়,
অন্য কোথা অন্য কোনো খানে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর শেষ রচিত কবিতা দু'টি উদ্ধৃত না করলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকবে বোধ করি। কবিতা দু'টি পাঠ করলে বোঝা যাবে, মৃত্যুভয় রবীন্দ্রনাথের কখনোই ছিল না, প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যে বলেছেন তিনি মৃত্যুঞ্জয়, সেকথা ঠিক।

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'
বিচিত্র ছলনা জালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখোনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাস সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক, অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।

লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে।
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেয়েছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

জোড়াসাঁকো
৩০শে জুলাই,
সকাল ৯॥ টা।

মৃত্যু

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে।
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু,
কষ্টের বিকৃত ভাণ, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত,
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।
যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হ'তে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে॥

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্য

রবীন্দ্র-কাব্যে গদ্য কবিতা একটা আকস্মিক ও অভিনব পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথ মূলত অভিজাত শ্রেণীর সাহিত্যিক এবং তাঁর রচনাবলীও প্রধানত অভিজাত স্তরেরই ছায়াচিত্র, কিন্তু তা হলেও মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে তাঁর লেখা অপ্রচুর নয়। প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে অতুচ্ছকে আবিষ্কারের একটা অত্যুগ্র আগ্রহই গদ্য কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মতবাদের গোড়ার কথা। অবশ্য সমাজে যারা তুচ্ছ, সামান্য ও সাধারণ, তাদের সকলের প্রতিই কবির সহানুভূতি প্রথম থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। তাদের চরিত্রের মধ্যে যে মহত্ত্ব, মাধুর্য ও অসাধারণতা কবি লক্ষ্য করেছেন তা তিনি তাঁর কাব্যে, গল্পে ও নাটকে রূপায়িত করে তুলেছেন। তাঁর 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার কৃষ্ণকান্ত, 'রাজা ও রাণী' নাটকের ভৃত্য শঙ্কর, 'খোকা বাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের ভৃত্য রাইচরণ, 'দুই বিঘা জমি'র মালিক দরিদ্র উপেন—সবাই কবির মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের শেষপর্যায় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলে এ বিষয়টা সবচেয়ে আগে ধরা পড়বে যে, অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে কবি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পথে আশ-পাশের চলতি সাধারণ ছবিগুলো ফুটিয়ে তোলার পক্ষে ছন্দোবদ্ধ পদ্যের চাইতে সহজ স্বচ্ছ গদ্যই ভালো উপায়। তাঁর এই অনুভূতির কথা কবি নিজেই বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে বলেছেন—

"অন্তরে যে-ভাবটা অনির্বচনীয় তাকে প্রেয়সী নারী প্রকাশ করবে গানে নাচে—এটাকে লিরিক বলে স্বীকার করা হয়। এর ভঙ্গীগুলিকে ছন্দের বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ; তারা সেই ছন্দের শাসনে পরস্পরকে যথাযথ-ভাবে মেনে চলে বলেই তাদের

সু-নিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত গতিতে একটি শক্তির উদ্ভব হয়, সে আমাদের মনকে প্রবল বেগে আঘাত দিয়ে থাকে। এর জন্যে বিশেষ প্রসাধন আয়োজন, বিশেষ রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক ঘটে। সে আপনার একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে, একটি দূরত্ব।

"কিন্তু একবার সরিয়ে দাও ওই রঙ্গমঞ্চ, জরির আঁচলা দেওয়া বেনারসী শাড়ী তোলা থাক পেটিকায়, নাচের বন্ধনে তনুদেহের গতিকে মধুর নিয়মে না-ই বা সংযত করলে, তা হলেই কি রস নষ্ট হল! তা হলেও দেহের সহজ ভঙ্গীতে কান্তি আপনি জাগে, বাহুর ভাষায় যে-বেদনার ইঙ্গিত ঠিকরে ওঠে, সে মুক্ত বলেই যে নিরর্থক এমন কথা যে বলতে পারে তার রসবোধ অসার হয়েছে, সে নাচে না বলেই যে তার চলনে মাধুর্যের অভাব ঘটে কিংবা সে গান করে না বলেই যে তার কানে কানে কথার মধ্যে কোন ব্যঞ্জনা থাকে না, একথা অশ্রদ্ধেয়। বরঞ্চ এই অনিয়ন্ত্রিত কলায় একটি বিশেষ গুণের বিকাশ হয়, তাকে বলব ভাবের স্বচ্ছন্দতা, আপন আন্তরিক সত্যেই তার আপনার পর্যাপ্তি। তার বাহুল্যবর্জিত আত্ম-নিবেদনে তার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কাছের সম্বন্ধ ঘটে। অশোকের গাছে সে আলতা-আঁকা নূপুর-শিঞ্জিত পদাঘাত না-ই করল, না হয় কোমরে আঁট-আঁচল বাঁধা, বাঁ হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান হাত দিয়ে মাচা থেকে লাউ শাক তুলছে, অযত্ন-শিথিল খোঁপা ঝুলে পড়ছে আলগা হয়ে; সকালের রৌদ্রজড়িত ছায়াপথে হঠাৎ এই দৃশ্যে কোনো তরুণের বুকের মধ্যে যদি ধক করে ধাক্কা লাগে, তবে সেটাকে কি লিরিকের ধাক্কা বলা চলে না—না হয় গদ্য লিরিকই হল, এই রস শালপাতায় তৈরি গদ্যের পেয়ালাতেই মানায়, ওটাকে তো ত্যাগ করা চলবে না। প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে, তার মধ্য দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা—গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্য-কাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের

ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্য ছন্দের মধ্যে আছে। যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লব-পুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসমতার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য।

"প্রশ্ন উঠবে—গদ্য তা হলে কাব্যের পর্যায়ে উঠবে কোন্ নিয়মে। এর উত্তর সহজ। গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিণী বলে কল্পনা কর, তা হলে জানবে তিনি তর্ক করেন, ধোপার বাড়ির কাপড়ের হিসেব রাখেন, তাঁর কাসি, সর্দি, জ্বর প্রভৃতি হয়, 'মাসিক বসুমতী' পাঠ করে থাকেন, এ সমস্তই প্রাত্যহিক হিসেব, সংবাদের কোঠার অন্তর্গত। এরই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর স্রোত উছলিয়ে ওঠে, পাথর ডিঙিয়ে ঝরণার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সে সঙ্গীতের শ্রেণীয়। গদ্য কাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সঙ্গে সঙ্গীত মিশিয়ে নেওয়া চলে। সেই মিশ্রণের উদ্দেশ্য সঙ্গীতের রসকে পুরুষের স্পর্শে ফেনায়িত উগ্রতা দেওয়া। শিশুদের সেটা পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু দৃঢ়দন্ত বয়স্কের রুচিতে এটা উপাদেয়।

"আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পেঁাছল না, এটা শোচনীয়। দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তা হলে শুম্ভ-নিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তখনই তিনি দেব-সাহিত্যে গদ্য-কাব্যের অধিকারী হন।"

'পুনশ্চ'র প্রথম কবিতা 'কোপাই'তে রয়েছে কবির এই মতবাদের স্পষ্ট পরিচয়। একদিক থেকে 'কোপাই'কে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার প্রতীক বলে ধরা চলে, আর পদ্মাকে তাঁর আভিজাতিক পূর্ব কবিতাবলীর। 'চিত্রা'র 'সুখ' কবিতায় কবি পদ্মাতীরের যে মনোরম চিত্র এঁকেছেন তা তাঁর অভিজাত-তৃপ্ত মনের বাসন্তীবর্ণে অভিরঞ্জিত—

চারিদিকে দেখে আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমেখে—
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্তজল,
মনে হলো সুখ অতি সহজ সরল।

ঐতিহাসিক কৌলীন্যে, ছন্দের জাঁকজমকে আর পোষাকী কথার অলংকারে যে পদ্মা পৃথিবীকে উপেক্ষা করে তার সৌখিনতার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ছুটে চলেছে অব্যাহত গতিতে, বহুদিন 'ওরই ঘাটে নিভৃতে, সবার হতে বহু দূরে' থেকে তারপর 'যৌবনের শেষে তরুবিরলমাঠের প্রান্তে' এসে কবি বলছেন—

এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী,
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,
ওর ভাষা গৃহস্থ পাড়ার ভাষা
তাকে সাধু ভাষা বলে না।

শুধু কি এই? আভিজাত্যের অহংকারলেশশূন্য নিরলংকার কোপাই অতি তুচ্ছকেও উপেক্ষা করে না, গ্রামের সকলের সব কিছুর সঙ্গে তার অন্তরের গভীর যোগাযোগ। সীমাহীন 'স্তব্ধ নীলাম্বরে'র সঙ্গেই বিরাট বিপুল 'স্থির শান্ত জল' পদ্মার বন্ধুত্ব মানানসই, কিন্তু কোপাই-এর বেলা—

তার ভাঙাতালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে
সাঁওতাল ছেলে
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাড়ি নিয়ে;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা;
আর মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

সাহিত্য সমাজেরই ছায়া এবং সমসাময়িক পরিবেশের প্রতিচ্ছবি। এক সময় ছিল যাকে বলা চলে অ্যারিস্টক্রেসির যুগ, যখন উচ্চশ্রেণীর সমাজপতি আর রাজা-মহারাজা-জমিদারদেরই অঙ্গুলিনির্দেশে চলত সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সব আদেবন-নিবেদন; জনসাধারণের তাতে কোনো অংশ নেবার উপায় থাকত না। সাহিত্যও তখন ছিল এই উপরতলারই সাহিত্য। তারপর ক্রমে এলেন গান্ধীজি—দেশের রাজনীতির মোড় ঘুরে গেল, সমাজচেতনা পেল নতুন রূপ। গণ-নায়করূপে গান্ধীজি আপামর জনসাধারণকে নিয়ে পরিচালনা করলেন দু'টো ব্যাপক রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ১৯১৯—১৯২৩ আর ১৯২৯—১৯৩৪ সালে। রাজনীতির নীচের তলার লোকদের দাবি স্বীকৃত হলো এবং সমাজে যারা তুচ্ছ বলে গণ্য, যারা অস্পৃশ্য সেই হরিজনদেরও তিনি দিলেন সম্মান। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ও সমাজে নগণ্য ও সাধারণকে মেনে নেবার এই মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায়, আর বিশেষভাবে গান্ধীজির অসহযোগ ও প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ই তা দেখা দিয়েছে। তাই দেখি 'লিপিকা'র প্রকাশ ১৯২২—২৩শে আর ১৯৩২—৩৩শে। অবশ্য মানুষ যে বিষয়বস্তু হিসাবে এর অনেক আগেই রবীন্দ্র-কাব্যে স্থান পেয়েছে তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে, তবে 'দিদি', 'চৈতালি' প্রভৃতি কবিতার মানুষগুলো সাধারণ মানুষের পর্যায়ে পড়ে না—তারা অভিনব, কতকটা কবি-বর্ণিত আর সব প্রাকৃতিক দৃশ্যেরই মতো। 'সন্ধ্যা' কবিতায় কবি যেখানে বলেছেন—

হেরো ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়াছে নীড়ে
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জলহীন;
ঘরে-ফেরা শান্ত গাভী গুটি দুই তিন

কুটির-অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য হ'ল সমাপন,—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি ভাবিছে কী জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।

সেখানে কবির মানব-প্রীতি গৌণ, প্রকৃতি-প্রীতিই মুখ্য! 'পলাতকা'য় সমসাময়িক সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে প্রথম কবিতা লেখা হলেও সেখানকার সবাই যেন সমস্যাক্লিষ্ট, তাই পূর্ণ কাব্যিক মূল্য কেউ পায়নি তারা। 'লিপিকা'র গদ্যকবিতা বাংলা ছন্দে আনল একটা প্রচণ্ড বিপ্লব, একমাত্র মাইকেলের ছন্দ-বিপ্লবের সঙ্গেই এর তুলনা চলতে পারে। পদ্যের বিকৃত ভাষার চাইতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চলতি ভাষাই যে অনেক বেশি মর্মস্পর্শী, এ সত্য যদিও 'লিপিকা'তেই ধরা পড়ল কবির কাছে, তা হলেও রূপকথাই এখানে পেয়েছে প্রশ্রয়। 'পরিশেষে'ই সর্বপ্রথম সাময়িক জীবনচিত্রের কাব্যমূল্য সফলভাবে স্বীকৃত হয়েছে; গদ্যকবিতার স্বচ্ছন্দ ও সহজ পথে 'পুনশ্চ'র কবিতাবলীতে এ স্বীকৃতি একেবারে অকুণ্ঠ। 'পুনশ্চ'র 'সাধারণ লোক' সবাই আমাদের সকলের এত পরিচিত যে, এদের কাউকে খুঁজে দেখতে বা দেখাতে হয় না। গদ্যছন্দে এই বইখানি তাঁর সাফল্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলেও পরবর্তী বহু কাব্যে এবং এমন কি শেষরচনা 'রোগশয্যা' এবং 'আরোগ্য'তেও রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দেই কবিতা-লক্ষ্মীর বন্দনা গেয়ে গেছেন। এই গদ্যকাব্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে, অভিজাত শ্রেণীসম্ভূত হলেও রবীন্দ্রনাথের মতো সমাজ ও সময়-সচেতন এত বড়ো বিপ্লবী কবি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

রবীন্দ্রনাথের গান

রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা দু'হাজারের কাছাকাছি; এর প্রত্যেকটিতেই সুর দিয়েছেন তিনি স্বয়ং। স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র হিসাব তুলে প্রমাণ করেছেন যে, পাশ্চাত্য জগতের শুবার্টের চেয়েও রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা অন্তত প্রায় তিনগুণ বেশি। জার্মাণ-সংগীতশিল্পী শুবার্ট রচনা করেছেন মোটে ৬০০ গান। আর নানা কাব্য, গানের বই, স্বরলিপি প্রভৃতি থেকে একমাত্র 'গীত-বিতানে'ই রবীন্দ্রনাথের ১,৭৮৫টি গান সংগৃহীত হয়েছে। এ ছাড়াও এদিকে ওদিকে কবির আরো কিছু গান যে ছড়িয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভা শেক্সপিয়র তাঁর নাটকের জন্যে যে ক'টি দরকার সে ক'টি গান বেঁধেই অপূর্ব সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলা তা নয়; প্রয়োজনের কোনো কথা নেই এখানে—খেয়ালেই সৃষ্টি, স্রষ্টার খেলা গল্পে, গানে, কাব্যে, ছবিতে। তাঁর সৃষ্টির অজস্রতাকে হার মানাবে তেমন কে আছে?

গানের চর্চা ঠাকুরবাড়িতে বরাবরই চলতো। সেখানে সর্বদাই নানা ওস্তাদের সমাগম হতো—গানের আসর সর্বদাই ছিল সরগরম। দেশি এবং বিলাতি, উভয় শ্রেণীর গানেরই অনবরত চর্চা চলতো। দেশি গান রবীন্দ্রনাথ শেখেন বিষ্ণু নামক এক ওস্তাদের কাছে। বিষ্ণুর গান শেখাবার প্রণালীতে নতুনত্ব ছিল। পাড়াগেঁয়ে ছড়ায় সুর সংযোগ করে ছেলেদের তিনি শেখাতেন; কথাগুলি চিত্তহারী বলে গানটা ছেলেদের প্রাণে যেন গেঁথে যেত, যেটা হিন্দুস্থানী গানের নিষ্প্রাণ কথার পক্ষে সম্ভব হতো না। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সংগীতে কথার প্রাধান্য দেবার জন্যে এত যে ব্যগ্র ছিলেন, সেটা বোধ হয় এই বিষ্ণুর প্রভাব।

এরপরে এলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গীতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।"

সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ কোনও প্রচলিত রীতির অনুশাসন মানেন নি। সংগীতকে তিনি ওস্তাদির দাসীবৃত্তি থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এখানে। নির্ভয়ে তিনি ইউরোপীয় সুর লাগাতেন গানে, সেই সঙ্গে দেশি, বাউল, ভাটিয়ালি আর কীর্তনের আমেজ মেশাতেও ইতস্তত করতেন না। তাঁর সংগীতে কথাই প্রাণ, সুর কেবল সেই কথাকে বিস্তৃত করে ঢেউ তোলে মাত্র। অবশ্য বাংলা গান মাত্রই বাণীপ্রধান। বাংলা গানের শ্রোতাকে কথার দিকে মন কিছুটা দিতেই হবে, শুধু সুর শুনে সে সুখী হতে পারে না। তাই বাংলা গান ভাল কবিতা না হলে উপভোগে ব্যাঘাত ঘটে। রবীন্দ্র-রচিত প্রায় ছ'হাজার গানের মধ্যে কবিতা হিসাবে প্রায় সবগুলোই অনন্য, সুতরাং গান হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

এমন পণ্ডিতম্মন্য ওস্তাদের অভাব এদেশে নেই, যাঁরা রবীন্দ্র-সংগীতের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। এমন আকাশস্পর্শী ধৃষ্টতা এদেশেই সম্ভব। তথাকথিত ওস্তাদি গানে সাফল্য অর্জন করাই যদি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য হতো তবে তিনি তাতেও সমভাবেই কৃতকার্য হতে পারতেন। রবীন্দ্র-সংগীতের অতি উৎসাহী বিরুদ্ধ সমালোচকদের নাসিকা কুঞ্চনের যথার্থ উত্তর দিয়েছেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। তিনি বলছেন—"সুর সংযোজনায় রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ রাগ রক্ষা করে চলেন নি—এ ধরণের সমালোচনা অহরহই শোনা যায়। সম্পূর্ণ শুদ্ধরাগ যে তিনি নেননি এ কথা সত্যি। বঙ্গ-বিধবার মত তিনি শুচিবায়ুগ্রস্থ ছিলেন না। কাজেই কোথাও

কোথাও শুদ্ধস্বরের পরিবর্তে কোমল সুরই হয়ত তাঁর মনোমত হয়েছে। গানের মাধুর্যের খাতিরে প্রচলিত রাগরূপ অগ্রাহ্য করেই তিনি সেখানে বসিয়ে গেছেন কোমল সুর।” এ প্রসংগেই ইন্দিরা দেবী আরো বলেছেন—“উচ্চাংগ সংগীতের জন্য নিরলস শ্রম চাই, চাই কৃচ্ছ্র সাধনা। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনের এ দুয়ের যোগ ঘটানো তো খুব সহজ কথা নয়। রবীন্দ্র-সংগীতকে সাধারণের নাগালে এনে দেবার জন্য তিনি সহজ সরল ও সুমিষ্ট অসংখ্য গান উপহার দিয়ে গেছেন। আমাদের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা সকল অনুভূতির সঙ্গেই মিশে রয়েছে তাঁর গান। রাগ-তাল সম্বন্ধে তিনি তো আর অজ্ঞ ছিলেন না,—বরং সে বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল বলেই তাঁর পক্ষে সহজে একাজ করা সম্ভব হয়েছিল। সীমার মধ্যে রেখেও সংগীতকে তিনি দিতে পেরেছিলেন সীমাতীত মুক্তির আনন্দ।”

পূর্বেই বলেছি, শিশুকাল থেকেই তিনি বিভিন্ন ওস্তাদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি যে ক্ষুদ্র ‘ক্ল্যাসিক্যাল’ গণ্ডীর সংকীর্ণ সীমানায় আপন সংগীত-প্রতিভাকে সংকীর্ণ করে রাখেন নি, এতে তাঁর শক্তির তাঁর প্রাণধর্মেরই পরিচয় পাই, যার সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর রচিত শিল্পকলার অপরাপর প্রদেশেও। ওস্তাদি গান বড়োজোর কানকে খুশি রাখে, প্রাণের সিংহদ্বারে তার রথ পৌঁছয় না। কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীতের রস বিজয়ী সম্রাটের মতো অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে, কোথাও তা বাধা পায় না।

রবীন্দ্র-প্রতিভা প্রাসাদের মতো। তার কক্ষের, অলিন্দের সংখ্যা নেই জানি, তার ঐশ্বর্যের নেই তুলনা, কিন্তু তবু মনে হয় সংগীতই ছিল তাঁর প্রতিভার খাসমহল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি ‘প্রবাসী’তে লিখেছিলেন—“আমার কবিতা যদি বা বেঁচে না থাকে তবু বাঙালী আমার গান ভুলতে পারবে না, বাংলার ঘাটে-মাঠে আমার গান চলবে।”

প্রত্যেক রচনার শেষেই ক্লান্তি আসে। দার্শনিক নিবন্ধই বলুন, আর গল্প বা উপন্যাসই বলুন, সবতাতেই একটা আড়াল আছেই, নিজেকে গুছিয়ে তোলবার জন্যে আছে একটা আপ্রাণ প্রয়াস। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে যেন তা ছিল না। এখানে তিনি যেন আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা কইতে পারতেন,—নিরলংকার, অনাড়ম্বর সরল প্রণালীতে। তাই দিনের পর দিন গেছে, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু,—রবীন্দ্রনাথ সংগীত রচনা করে চলেইছেন। প্রতি ঋতুতে প্রকৃতির দৃশ্যপটে যে প্রভেদ, যে বৈচিত্র্য দেখা দিত, রবীন্দ্রনাথের গানে তার ছায়া পড়তোই। যেমন তার সংখ্যার প্রাচুর্য তেমনি তার ভাব-বৈচিত্র্য। রবীন্দ্র-সংগীতে ধনৈশ্বর্যের ছড়াছড়ি, সেখানে রূপের মায়া, স্বরের ইন্দ্রজাল। কোনও একটি গানে রবীন্দ্রনাথ অপর একটি গানের পুনরুক্তি করেছেন বলে মনে পড়ে না। বৈভব আর বৈচিত্র্যের আসন তাঁর গানে পাশাপাশি; ব্রহ্মসংগীত পাবেন (ব্রহ্মসংগীতের শতকরা প্রায় ৯০টি গানই তাঁর); পাবেন স্বদেশি গান, যা একদিন দেশের প্রাণে প্রাণে আগুন ছড়িয়েছিল; পাবেন 'গীতাঞ্জলি'র ভাবসমৃদ্ধ সংগীত, 'দেশ দেশ নন্দিত করি' যার ভেরী মন্দ্রিত। তা ছাড়া প্রাত্যহিক সুখ, দুঃখ, নিরাশা, আনন্দ রবীন্দ্রনাথের গানে এমন সহজ রূপ পেয়েছে যে, নিজের মনের ভাবনাগুলোর প্রতিবিম্ব কবির গানের মধ্যে দেখে নিজেদেরই বিস্ময়ে চমকে উঠতে হয়। একটা কথা এর সঙ্গে স্মরণীয় যে, যখন এদেশে তাঁর কবিতা নিয়ে সংশয় ও বিতর্কের অবধি ছিল না, তখনি তিনি সংগীতকার হিসাবে দেশের লোকের মনে পাকা আসন করে নিয়েছিলেন। তাঁর গান ছড়িয়ে পড়েছে, দেশের মাঠে মাঠে, কুটিরে, প্রাসাদে, সভায়, নিভৃত আলাপ-কুঞ্জে।

রবীন্দ্র-কাব্য মহৎ। কিন্তু তাঁর সংগীত মহত্তর। এমন কি একথাই বরং বলা যায় যে, তাঁর কাব্য আর গানের মধ্যে

কোনো সত্যিকারের সীমারেখা নেই। একই সুর, মোটা আর সরু, এই মাত্র তফাৎ। কোনো কোনটিতে গান আর কবিতা মিশে গেছে, সেটা সৃষ্টির no man's land!

রবীন্দ্র-সংগীতের সার্থক ব্যাখ্যাতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্র-সংগীতকে চারটি বিশেষ পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ের গানগুলো সম্বন্ধে সৌম্যেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, অনাড়ম্বর শাস্ত্র-গাম্ভীর্যের সঙ্গে সঙ্গে রাগ-সংগীতের সুস্পষ্ট পরিচয়ও মেলে এসব গানে। দ্বিতীয় পর্যায়ের নানা গানে নতুন নতুন রাগ আমদানী করেছেন কবি এবং সেগুলো বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সমন্বয়ে তাঁরই সব অভিনব সৃষ্টি। তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যায়, লোকসংগীতের আকর্ষণে কবি ভারতীয় বিশুদ্ধ সংগীতের ঐতিহ্যের বাইরে বেরিয়ে এসে বাঙলার মাটির সুরে বিমোহিত। চতুর্থ পর্যায়ে কবি আবার নেমেছেন সমন্বয়ের কাজে—এবারে তাঁর কাজ বিশুদ্ধ ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সঙ্গে লোকসংগীতের সহজ ধারার মিলনসাধন। নির্বিশেষ পটভূমিকায় বিশেষকে প্রতিষ্ঠাদান, এও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আর এক বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্র-সংগীত একেবারে বন্ধনহীন আকাশচারী, কেবলমাত্র সুরের পাখায় আশ্রয়ী। এই সুরের বৈচিত্র্য তাঁর গানে যত বেশি এদেশের আর কোনো সুরকারের রচনায় আজ পর্যন্ত ততটা দেখা যায়নি। তার একটা বড়ো কারণ রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙলার নিজস্ব সুর-সমুদ্রে অবগাহন করেই তুষ্ট থাকতে পারেন নি, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তীয় সংগীতের তথা পাশ্চাত্য সংগীতের সুর-লহরীর আকর্ষণ তিনি গভীরভাবে অনুভব করতেন এবং সেই অনুপ্রেরণার ফলেই কবি শেষ অবধি-নানা ক্ষেত্র থেকে নানা সুর চয়ন করে বাংলা গানের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলেছেন। কিন্তু তাই বলে কোনোক্ষেত্রেই তিনি নকলনবিশি করেন নি, আপন অন্তর ঐশ্বর্যের রঙ মিশিয়ে প্রত্যেকটি আহৃত সুরকে আবেগ-ঘন মধুরতায়

সুন্দরতর করে তুলেছেন। সুরকার হিসাবে তাঁর আর একটা বড়ো অবদান রয়েছে। তিনিই প্রথম জোর দিয়ে বলছেন যে, কবিতার কোনো কলি বা কথা বদল করবার যেমন কোনো অধিকার কারুর নেই, সুরকারের সৃষ্টিও তেমনি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। কোনো গায়কই স্রষ্টার দেওয়া সুরের একচুলও পরিবর্তন করতে পারেন না। কিন্তু এরূপ পরিবর্তন যতই অন্যায় বা অবাঞ্ছনীয় হোক না কেন রবীন্দ্র-সংগীতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'অনিবার্যভাবেই তাতে বিকৃতি এসে যাচ্ছে'। গোড়াতেই যে গলদ রয়ে গেছে। কবির প্রতিটি গানকে প্রথম থেকেই যদি স্বরলিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা হ'ত তা হলে রবীন্দ্র-সংগীতে সুরের এমন বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারত না। এ বিষয়ে কবি নিজেই যে ছিলেন উদাসীন। তাঁর গান গলায় তুলে নিয়েই সুরশিল্পীরা খুশি। এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সংগীত নাটক আকাদেমি থেকে প্রকাশিত Five hundred songs of Rabindranath গ্রন্থের ভূমিকায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী যে মন্তব্য করেছেন তারপরে আর কিছু বলার থাকে না। তাঁর বক্তব্য, পাশ্চাত্য গীতিকারেরা সংগীত রচনার সঙ্গে সঙ্গে তা স্বরলিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তাই তাঁদের গান নিয়ে কখনো সুর-বিভ্রাট ঘটে না। রবীন্দ্রনাথও যদি তাই করতেন তবে তাঁর গানের সুর নিয়েও বিরোধ-বিসম্বাদ দেখা দিত না। কিন্তু সে ব্যবস্থা যখন করা হয়নি দোষ দেওয়া যাবে কাকে? রবীন্দ্রনাথের 'সকল গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ কবির অসংখ্য গানের সুর সংরক্ষণ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর বিদায়ের পর থেকেই দেখা দিয়েছে যত বিশৃঙ্খলা। সত্যই তাই, রবীন্দ্র-সংগীতের সুরলোকে অসুরের দাপাদাপিকে সংযত করবেন এখন আর কে আছেন এমন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে কথাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, একথা বলতে কেউ যেন না বোঝেন যে, তাঁর গানে তিনি সুরকে খাটো করেছেন।

তাঁর গানে কথা ও সুর কর্ণের কবচ আর কুণ্ডলের মতো সহজাত। তাঁর কাছে সুর ও কথা এক সঙ্গে আসে হর-গৌরীর মতো। গৌরী থেকে বিচ্ছিন্ন করলে হরকে পিশাচ এবং গৌরীকে শীর্ণা কুমারী বলে ভ্রম হয়। 'কথার সঙ্গে সুর রবিকাকার মতো কেউ মেলাতে পারেনি' একথা বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-সংগীতে একটি বিশিষ্ট কায়দা আছে। সেটাকে আয়ত্ত করতে হলে প্রবেশ করতে হবে তার ভাবের অন্তরালে।

প্রাণের একটা আশ্চর্য আবেদন তাতে আছে বলেই রবীন্দ্র-সংগীত এত চিত্তহারী। কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্র-সংগীত গাওয়াও যে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যোগ করার মতোই সহজ, একথা যেন কেউ না ভাবেন। সর্বজনীন আবেদন তো আছে ফুলেরও, কিন্তু তাই বলে একটি ফুল সৃষ্টি করা সহজ নয়। কবিও বলেছেন, 'তোরা কেউ পারবিনে রে, পারবিনে ফুল ফোটাতে।' যথার্থ দরদীর সাক্ষাৎ পেলে ফুলে পাপড়ি আপনা থেকেই খুলে আসে, ভাবের অন্তরঙ্গ রূপ ধরা দেয় সুরের মায়ায়।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

বাংলাদেশে ছোটগল্পের প্রবর্তনও রবীন্দ্রনাথই প্রথম করেন। ইতিপূর্বে বঙ্কিম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন। উপন্যাস লেখার একটা পথও গিয়েছিল খুলে; কিন্তু সে পথ শীর্ণকায়, আমাদের জীবনের বাইরেকার চিত্রই ছিল তার উপজীব্য। অবশ্য বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কিংবা 'বিষবৃক্ষে' তৎকালীন সমাজ-চিত্রের একটা বিশিষ্ট নিদর্শন ফুটেছে। কিন্তু গ্রাম্যজীবনের ছোটখাটো আশা-নিরাশা, সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, বেদনাকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম তাঁর ছোট গল্পে মূর্ত করে তুললেন। তাঁর গল্পে আমরা পেলাম বাংলার পল্লীজীবনের সহজ সরল রূপ; সমতল জীবনের নীচেও যে আশা-নিরাশার ঢেউ স্পন্দিত, একথা আমরা আবিষ্কার করলাম। অবশ্য এরূপ অভিযোগ শোনা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন নিয়ে তেমন বেশি কিছু লেখেন নি। এর উত্তরে কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রবীন্দ্রনাথ অকৃপণ হস্তে যখন বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প পরিবেশন করে চলেছেন সে সময় দেশের জীবিকা-সংগ্রাম তেমন তীব্র হয়ে দেখা দেয়নি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিভক্ত হয়ে পড়েনি। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে শ্রেণী-চেতনা বা শ্রেণী বৈষম্যকে কখনো বড়ো করে দেখাবার প্রয়াস পান নি, মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতিই সবক্ষেত্রে বড়ো কথা, শ্রেণী বা জাতির ব্যাপার নিতান্ত গৌণ, আকস্মিক ও অকিঞ্চিৎকর।

এখানে মধ্যবিত্ততার নালিশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের কৈফিয়ৎটা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—"পলিমাটি কোনো স্থায়ী কীর্তির ভিত বহন করতে পারে না। বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো সৌধ পাওয়া যায় না, যা প্রাচীনতার স্পর্ধা

করতে পারে। এদেশের আভিজাত্য সেই শ্রেণীর। আমরা যাদের বনেদি বংশীয় বলে আখ্যা দিই, তাদের বনেদ বেশি নীচে পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এরা অল্পকালের পরিসরের মধ্যে মাথা তুলে ওঠে, তার পরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্য সেইজন্যে একটা আপেক্ষিক শব্দমাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন করা বিড়ম্বনা, কেন না, সেই কৃত্রিম উচ্চতা কালের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই কারণে আমাদের দেশের অভিজাত বংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। একথা সত্য, এই স্বল্পকালীন ধন-সম্পদের আত্মসচেতনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহংকারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক রাখবার আড়ম্বর করে। এই হাস্যকর বক্ষস্ফীতি আমাদের বংশে অন্তত আমাদের কালে একেবারেই ছিল না। কাজেই আমরা কোনোদিন বড়োলোকের প্রহসন অভিনয় করিনি। অতএব আমার মনে যদি কোনো স্বভাবগত বিশেষত্বের ছাপ পড়ে থাকে তা বিত্তপ্রাচুর্য কেন, বিত্তসচ্ছলতারও নয়। তাকে বিশেষ পরিবারের পূর্বাপর সংস্কৃতির মধ্যে ফেলা যেতে পারে এবং এ রকম স্বাতন্ত্র্য হয়তো অন্য পরিবারেও কোনো বংশগত অভ্যাসবশত আত্ম-প্রকাশ করে থাকে। বস্তুত একটা আকস্মিক আশ্চর্য এই যে, সাহিত্যে এই মধ্যবিত্ততার অভিযান সহসা অত্যন্ত মেতে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে তরুণ শব্দটা এই রকম ফণা তুলে ধরেছিল। আমাদের দেশে সাহিত্যে এই রকম জাত ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হালে। আমি যখন মস্কৌ গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমার অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোকর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেলবন্ধনে জাতিচ্যুতি দোষ ঘটেছে, সুতরাং তাঁর নাটক স্টেজের মঞ্চে পংক্তি পেল না। সাহিত্যে এই মনোভাব এত বেশি কৃত্রিম যে, শুনতে পাই, এখন আবার হাওয়া

বদল হয়েছে। এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস—এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপ সিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয়, এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে, তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।"

'বস্তুতন্ত্রতাবিহীন' বলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এক সময়ে যে সমালোচনার ঢেউ উঠেছিল সে অভিযোগ যে রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প সম্পর্কে কোনোক্রমেই প্রযোজ্য নয় সে কথা খুব জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন সুধী সাহিত্য-সমালোচক ডক্টর সুকুমার সেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প কিছুতেই কল্পনাবিলাসের রঙীন ফানুষ নয়; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অপরোক্ষ অনুভূতির অপূর্ব সমবায়ে কবির মানসে যে গভীরতর সত্য-সৃষ্টির সুধারস সঞ্চিত হইয়াছিল তাহারি এক প্রকাশ এই ছোট গল্পগুলিতে।...এই গল্পগুলির মধ্যে চোখে দেখা মানুষের সুখদুঃখময় যে জীবনখণ্ড আবহমান প্রাণপ্রবাহের ভঙ্গ-তরঙ্গমাত্র, তাহারি গভীর আনন্দ-স্রোতে মানবজীবনের ক্ষণিক ভালবাসা-ভাললাগা ও আপাত তুচ্ছতা-ব্যর্থতা-বেদনা সবই একটি যেন অলৌকিক সার্থকতায় পৌঁছিয়াছে, মানবজীবনের অসার্থকতার ব্যথা বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনার মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে, মানবপ্রেমের দহন বিশ্বচৈতন্যের আনন্দরসে নির্বাপিত হইয়াছে।...অজ্ঞাত অখ্যাত নিতান্ত সাধারণ মানুষের ব্যর্থতা-বেদনার 'সাত সমুদ্র

পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া যেখানে বিশ্বব্যাপী সমবেদনা অপেক্ষা করিয়া আছে সেখানে পৌঁছিয়াই যেন কাহিনী যথার্থ বিরাম লাভ করিয়াছে। হিউম্যানিটি বা বিশ্বমানবতার গভীর সমবেদনাজাত আনন্দবোধই এই সুবৃহৎ চরিতার্থতা।...তাঁহার ছোটগল্পে—সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না, সেখানে তাহারা কথা কহিয়াছে, লোকসমাজে যাহারা একপ্রান্তে উপেক্ষিত হয় সেখানে তাহাদের এক নূতন গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে, পৃথিবীতে যাহারা একান্ত অনাবশ্যক বোধ হয় সেখানে দেখি তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা, আত্মবিসর্জনের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে।'

বাস্তবিকই এক হিসাবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছোটগল্পেরই বিশেষ উপযোগী। সবার উপরে তিনি গীতিকবি। বাহুল্যকে কোণঠাসা করে নিভৃত একটি সুর বাজানোই গীতি-কবিতার রীতি। ছোটগল্পেও তাই। এতে ধারাবাহিক কোনো ইতিহাস থাকে না, বহু লোকের ভিড় থাকে না। দু'চারটি ঘটনায়, দু'চারটি কথায় দু'চারটি লোকের বেদনাকে আভাসে, ইঙ্গিতে স্পষ্ট করে তোলাই ছোটগল্পের ধর্ম। তাই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্য দিয়েই তাঁর গীতি-কাব্যপ্রবণ অন্তরটি আত্মপ্রকাশ করেছে।

১২৯৮ সালের কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জমিদারি দেখাশোনার কাজের ভার নিয়েছেন। শিলাইদহে বোটে তাঁর দিনগুলো কাটছে। পদ্মার দুই ধারে ছোটো ছোটো গ্রাম, অসংখ্য গ্রাম, অসংখ্য চাষী প্রজা। রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন তাদের সংস্পর্শে আসছেন, তাদের অভিযোগ, অভাব ইত্যাদি প্রত্যহ তাঁকে শুনতে হয়েছে। এদেরই মাঝখানে কবি-প্রতিভা আপন আসন পেতে নিলো। নিতান্তই লৌকিক দুঃখ-সুখের মধ্যে কবিচিত্ত খুঁজে বেড়ালো অলৌকিককে। 'পোস্ট মাষ্টার' গল্পটির বিষয়বস্তু

অসাধারণ কিছু নয়, পাত্রপাত্রীও নিতান্তই সাধারণ মানুষ, কিন্তু গল্পটির মধ্যে যে কোমল ও ব্যথিত সুরটি স্পন্দিত, সেটুকু সাধারণ নয়। সমস্ত আটপৌরে পরিবেশকে তুচ্ছ করে গল্পটির অন্তর্গূঢ় যে বেদনা, তা সাহিত্যের নিত্যবস্তু চিরকালের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। এই অনুভূতি আছে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পেও। সুদূর পার্বত্য দেশের একটি অপরূপ মানুষের সঙ্গে বাংলার একটি বালিকার স্নেহসম্বন্ধ গল্পটির বিষয়বস্তু। কিন্তু করুণার আলোকে, অনুকম্পা আর সহানুভূতিতে কাবুলিওয়ালা আর কাবুলিওয়ালা নেই, দেশকাল মুছে গিয়ে, একটি স্নেহবঞ্চিত বুভুক্ষু পিতৃহৃদয়, আর একটি সহানুভূতি-স্পন্দিত কবি-প্রাণ গল্পটিতে শাশ্বত হয়ে আছে। 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলো সম্বন্ধে কবি একখানি চিঠিতে লিখছেন, "আমার বয়স তখন অল্প ছিল। বাংলা দেশের পল্লীতে ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ করে ফিরেছি। সেই আনন্দের পূর্ণতায় গল্পগুলি লেখা। চিরদিন এই গল্পগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয়…।" কিন্তু প্রথম দিকে দেশে এসব গল্প যথেষ্ট অভ্যর্থনা লাভ না করায় কবি-মন ক্ষুব্ধ হলেও পরে তাদের জনপ্রিয়তা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানব-জীবনের যে নিবিড় যোগাযোগ দেখতে পাই, তার জন্যেও তাঁর কবিচিত্তই দায়ী। প্রকৃতিকে তিনি জীবন থেকে আলাদা পরিপ্রেক্ষিতে দেখেন নি, তাকে মানবজীবনের সুন্দর এবং স্বাভাবিক পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতি তো নিস্তরঙ্গ নয়; সে সজীব, সে প্রাণময়। মানুষের মর্মবেদনা মানুষের কাছে গোপন থাকতেও পারে; কিন্তু প্রকৃতি প্রকৃত মরমী।

প্রকৃতির পটভূমিতে রচিত এই গীতধর্মী গল্পগুলোর পাশাপাশি আমরা আর এক ধরণের গল্প রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে পাই, যাকে বলা যেতে পারে অতিপ্রাকৃত। উদাহরণ—'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি। স্বাভাবিক পরিবেশে যার স্বরূপ ধরা পড়ে না,

আমাদের জীবনের ইতিহাসের সেই নিষ্ঠুর সত্যগুলো অতিপ্রাকৃতের রহস্যঘন আবেশে এমন বীভৎস ও করুণ হয়ে উঠেছে, যা শুধু সর্বাঙ্গের শিহরণের মধ্য দিয়ে উপভোগের—যা একমাত্র অনুভূতির ধন, বিশ্লেষণের দুঃসাহসী প্রচেষ্টায় তাদের আসল রূপটির মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র ভাষাও যেন তার ভাব ও আবেষ্টনীর প্রতিধ্বনি—

"তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুর-কুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে?...সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্বণ এবং সিরাজের স্বর্ণ মদিরার মধ্যে সুরের ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত! কি অসীম, কি ঐশ্বর্য, কি অনন্ত কারাগার!...তাহার পরে সেই রক্ত-কলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে?"

এই ভাষার তুলনা বাংলা সাহিত্যে আর আছে কিনা সন্দেহ। 'গল্পগুচ্ছে'র ভাষা ও ভঙ্গি বহুকাল পর্যন্ত বাঙালী পাঠকের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অথচ আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পই এমন কি কথোপকথন পর্যন্ত সাধুভাষায় লেখা। ভাষা যা-ই হোক, তাঁর গল্প বলার ধরণে এমনই একটা শান্ত, অন্তরঙ্গ ও ঘরোয়া আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে পড়ে যাতে অতি-আধুনিক মনও বিস্ময়বিমুগ্ধ না হয়ে পারে না। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মতো অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি গল্পে আছে। 'নিশীথে' গল্পটির "ও কে, ও কে, ও কে গো" এই আর্তনাদে আমাদের দেহে রোমাঞ্চ হয়। 'মণিহারা' গল্পটিও এই পর্যায়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের আরেক ধরণের ছোটগল্প আছে, যার শুধু রচনার সৌন্দর্যই আমাদের মুগ্ধ করে না, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি মিলে মানুষের

যে মন, তার ঘাতপ্রতিঘাতই গল্পগুলোর বিষয়বস্তু। পূর্বোক্ত গল্পগুলোতে আমাদের সমাজকে দূর থেকে দেখা, তাই ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখই সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'মধ্যবর্তিনী' প্রভৃতি গল্প রচনার কালে কবি একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছেন সামাজিক মানব-মনের, ঘরোয়া জীবনযাত্রার মধ্যেও যে কত বড়ো ট্র্যাজেডি থাকে, নিপুণ বিশ্লেষণে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন। আর একটি গল্প 'মেঘ ও রৌদ্র'। এই 'মেঘ ও রৌদ্র' গিরিবালা ও শশিভূষণের মধ্যেকার দৃঢ় ও পবিত্র সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। শেষ পর্যন্ত গল্পটি অতি করুণ। গল্পটির আর একটি প্রধান গুণ এই যে, তৎকালীন রাষ্ট্রজীবনের অসন্তোষ ও আমলাতান্ত্রিক অনাচারের কাহিনী এতে বিশেষ স্থান পেয়েছে। 'হালদার গোষ্ঠী'র মতো গল্পে ক্ষয়িষ্ণু ধনী পরিবারের পরিচয় পেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়, 'শাস্তি'র মতো গল্পে পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে নিম্নশ্রেণীর নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

নামের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মূল্য নিরূপণের চেষ্টা নিরর্থক। মোটামুটিভাবে বিশিষ্ট কয়েকটি গল্পের নামের উল্লেখমাত্রই করা যেতে পারে। সৌন্দর্য বিশ্লেষণের স্পর্ধা রাখি না। 'মাল্যদান', 'মাস্টার মশাই' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ও দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এক হয়ে মিশে গেছেন।

তথাপি একটি গল্পের উল্লেখ না করলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে মনে করি। গল্পটির নাম 'নষ্টনীড়'। আকৃতির দিক থেকে গল্পটি উপন্যাসের কাছাকাছি হলেও, এর মধ্যে বিষয়বস্তুর ঐক্য এবং আবেগের তীব্রতা প্রভৃতি খাঁটি ছোটগল্পের সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান, তাই কবি একে ছোটগল্পের পর্যায়েই ফেলেছেন। অতি-আধুনিক যৌন-সমস্যা, হৃদয়ঘটিত ঘাতপ্রতিঘাতের উপর রবীন্দ্রনাথ গল্পটিকে এমন সুকৌশলে দাঁড় করিয়েছেন যে, আধুনিক কালেও তা একটি আদর্শ গল্প বলেই বিবেচিত হবে। এই গল্পের মধ্যেই হৃদয়-

প্রবণ রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ই যুক্তির আশ্রয়ী হয়েছেন, যা আমরা পরবর্তী কালে 'স্ত্রীর পত্র', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতিতে পাই। অমল-চারু-ভূপেশের সম্পর্ককে কবি হৃদয়ের তৌলে ওজন করেন নি, যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষে তাদের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে 'স্ত্রীর পত্রে'র নামোল্লেখও অপরিহার্য। ইতিপূর্বে আমাদের সংস্কারজীর্ণ পুরানো সমাজের অনাচারের বিরুদ্ধে যে সব অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, তার মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতার দাবি অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত নারীজাতির হয়ে তাঁর বক্তব্য জ্ঞাপন করলেন, প্রাঞ্জল উক্তি, কোনোখানে প্যাঁচ নেই, দুর্বোধ্যতা নেই। মৃণাল তার স্বামীকে পত্র লেখার অছিলায় সমস্ত পুরুষ-সমাজকে তার কথা শুনিয়ে দিল, বাঙালী পাঠকসমাজে একটা স্তম্ভিত বিস্ময়ের উত্তেজনা দেখা দিল। সুতীব্র শ্লেষ ও তীক্ষ্ণ যুক্তির এ এক অপূর্ব সংমিশ্রণ!

'স্ত্রীর পত্রে'র পর রবীন্দ্রনাথ 'পয়লা নম্বর' এবং 'নামঞ্জুর' গল্প রচনা করেন। 'নামঞ্জুর' গল্পে তিনি আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ফাঁকির দিকটা আলোচনা করেছেন, এবং তারি পাশাপাশি কয়েকটি নরনারীর হৃদয়-বেদনার কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। 'নামঞ্জুর' গল্পের পর রবীন্দ্রনাথ বহু কাল কোনো গল্প রচনা করেন নি। প্রায় ১৫।১৬ বছর পর তিনি ১৩৪৭ সালে একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। বইটির নাম 'তিনসঙ্গী'। 'রবিবার', 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরি' এই তিনটি অসাধারণ গল্পের সংকলন 'তিনসঙ্গী'। পনেরো বছরের প্রভেদ, কিন্তু ছোটগল্প রচনায় তাঁর নৈপুণ্য অক্ষুণ্ণই আছে দেখা গেল। শুধু তাই নয়, পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষরে এ গল্প কয়টি সমুজ্জ্বল। বর্ণনার শ্লেষে, ভাষার চমৎকারিত্বে, ব্যক্তিত্বপ্রধান চরিত্র-চিত্রণে এবং ভঙ্গির অনুকরণীয়তায় এই তিনটি গল্প রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের আসরে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 'গল্পগুচ্ছে'র গীতধর্মী

প্রকৃতিপ্রেমী গল্পকার রবীন্দ্রনাথ এ গল্প কয়টিতে অনুপস্থিত। এখানে অশীতিপর বৃদ্ধের যুক্তিনিপুণ বিজ্ঞানধর্মী চেতনার প্রখর বিশ্লেষণমূলক প্রকাশ ঘটেছে বাস্তবতার সমারোহের মধ্যে। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের মোহিনী চরিত্র বলিষ্ঠতায় অতুলনীয়। এ গল্প শেষ করে লেখকের নিজেরই মনে হয়েছে, এ পড়ে লোকে বলবে, 'আশি বছর বয়সে রবিঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে,···এটা ওঁর লেখা উচিত হয়নি।'

স্নেহাস্পদ শ্রীঅজিত বসু মল্লিকের কাছে রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠি প্রসঙ্গে ছোটগল্পের তত্ত্বকথা সম্বন্ধে লিখেছেন—"ছোটগল্পের তত্ত্বকথা জানতে চেয়েছ। যারা লেখে তারাই কি জানে? রচনার দ্বারাই এর মীমাংসা হয়, ব্যাখ্যার দ্বারা হয় না। লেখকেরা নিজের অগোচরে লেখে, পাঠকদের কাছেই সমস্তটা গোচর হয়, এই জন্যে তত্ত্বনির্ণয় ও বিচার করার ভার তাদেরই পরে। যারা theory আগে গ'ড়ে, তারপরে লিখতে বসে, বিপদ ঘটে তাদের—আজকাল তার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।"

আমাদের সমতল জীবনের সঙ্গে, দেখা গেছে, ছোটগল্পই মানায় বেশি। পরিসর কম, অথচ হৃদয়াবেগের তীব্রতা, ভারতীয় জীবনের যেটা বৈশিষ্ট্য, সেটা ছোটগল্পেরও। রবীন্দ্রনাথের কবিতা শ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাঁর বহুমুখী প্রতিভা যত অলৌকিক সৃষ্টির জন্যে দায়ী, তার মধ্যে ছোটগল্পই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

মহাকাব্য যদি হয় প্রাচীন যুগের, উপন্যাস একালের সৃষ্টি। উপন্যাসের দৈর্ঘ্য, তার চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনার বহুল জটিলতা—এসব আমরা প্রাচীনকালের সাহিত্য-রচনায় পাইনে। উপন্যাসের প্রচারের জন্যে যন্ত্রযুগ কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী, একথা মানতেই হবে। মুদ্রাযন্ত্র যখন ছিল না, তখন জনসাধারণের সাহিত্য-স্বাদ পাবার উপায় ছিল মাত্র দু'টি ; এক নাটক, দুই কাব্য। নাটক চোখে দেখার, কাব্য কানে শোনার—একটি দৃশ্য, অপরটি শ্রাব্য। এ উভয়ের সংমিশ্রণে আরেক ধরণের আনন্দ দানের আয়োজন ছিল, যেমন যাত্রা, কবিগান ইত্যাদি।

মুদ্রাযন্ত্র এসে মোড় ফিরিয়ে দিলে। শিল্প-বিপ্লব ও নতুন বণিক-সভ্যতার প্রসারে তখন সর্বত্র একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছে। তাদের চাহিদার যোগান দিতে হবে, প্রথমত পুরানো নাটক আর মহাকাব্য পুনর্মুদ্রিত করেই কাজ চালাবার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু দুই-একবার ভুল করে, টাল সামলিয়ে সাহিত্য রচয়িতারা ঠিক পথ পেয়ে গেলেন,—উপন্যাস। উপন্যাসই এই যুগের জটিল জীবনযাত্রার উপযুক্ত প্রতিবিম্ব।

আমাদের দেশেও উপন্যাস লেখার ধূম পড়ে গেল উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। কিন্তু শক্তিশালী লেখকের অভাবে সে প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হলো না, যতদিন না বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সক্ষম এবং যাদুময়ী লেখনী নিয়ে সাহিত্যের আসরে দেখা দিলেন। লেখা হলো 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী'। দেশময় একটা সাড়া পড়ে গেল। আমাদের দেশেও তবে এ সম্ভব!

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের জন্যে মালমশলা আহরণ করেছিলেন সদ্যোমৃত ভৌমিক যুগ থেকেই, সমসাময়িক সমাজের প্রতি তাঁর

বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। কেননা, তাঁর যুগে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ তখনো ঠিক গড়ে ওঠেনি। অবশ্য তিনি সমসাময়িক জমিদার শ্রেণী থেকেও উপন্যাসের বিষয়বস্তু আহরণ করেছিলেন। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনারও তিনিই প্রবর্তক।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোতে বাস্তব অপেক্ষা রোমান্সের প্রভাবই বেশি। বিশ্লেষণের চেয়ে ঘটনার বাহুল্য, যুক্তির চেয়ে আদর্শের আবেগই তাঁর উপন্যাসে প্রবল। এই সমস্ত রোমাঞ্চ-রস-প্রধান উপন্যাস কল্পনা ও মাধুর্যে সার্থক হলেও বাস্তবতার বিচারে সর্বত্র অসঙ্গতি-মুক্ত নয়।

তবুও উপন্যাসের যে কাঠামোটি বঙ্কিম দাঁড় করিয়ে দিলেন, তাতে বহুকাল সেই ছাঁচেই প্রতিমা গড়া হলো। রমেশ দত্তও প্রধানত বঙ্কিমেরই অনুসারী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচিত উপন্যাস দু'টিও মুখ্যত বঙ্কিমচন্দ্রের ছত্রছায়াতলে বসেই রচনা। সামাজিক উপন্যাসে বৈচিত্র্যের অভাবের জন্যেই হোক বা যে কারণেই হোক তার প্রতি তৎকালীন লেখকসমাজ তেমন নিষ্ঠা দেখান নি।

রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষি' ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৭ সালের মধ্যে রচিত। এ যুগে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বড়ো বেশি ছিল না, রকমারি মানুষ তিনি বড়ো দেখেন নি। অভিজ্ঞতার অভাবকে তিনি আদর্শ, আবেগ আর কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নিয়েছিলেন, ফলে তাঁর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা কেউই স্বাভাবিক মানুষ হয় নি। প্রতাপাদিত্যের মধ্যে মানবিকতা ততটা নেই, তার ক্রূরতা ও হিংস্রতা মাত্রাধিক। উদয়াদিত্যের শরীরেও রক্তমাংস বিশেষ আছে বলে মনে হয় না, সেও একটা অস্পষ্ট আইডিয়ার ছায়াময় প্রতিরূপ। একমাত্র বসন্তরায়ের আত্মভোলা প্রকৃতির মধ্যেই যা একটু সত্যের সন্ধান মেলে; এবং এই ধরণের চরিত্রের উপর রবীন্দ্রনাথের যে একটা বিশেষ পক্ষপাত ছিল, তা তাঁর পরবর্তী কালের নাটক থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাবে।

'বৌঠাকুরাণীর হাট' অপেক্ষা 'রাজর্ষি' কিঞ্চিৎ সফল হলেও অনেকগুলো দুর্বলতা তার মধ্যেও স্পষ্ট। কর্মযোগী আদর্শ দেশসেবী বিল্বনের মহত্ব আকর্ষণীয় হলেও এই চরিত্রের কৃত্তিমতা সহজেই ধরা পড়ে। গোবিন্দ মাণিক্যের চরিত্রে মহৎ গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও তেমন কোনো আকর্ষণ নেই, কেননা, তাতে বিরোধী বৃত্তির অভাব। বিভিন্ন বৃত্তির দ্বন্দ্ব একমাত্র রঘুপতির মধ্যেই আছে, সেই কারণে একমাত্র 'রঘুপতির চরিত্র জটিল ও জীবন্ত।' তবে এই 'রাজর্ষি' থেকেই উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমপ্রভাব থেকে রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

প্রায় পনেরো বছর পরে রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' রচনা করলেন। 'চোখের বালি' (১৯০৩) বাংলা উপন্যাসের রাজপথে একটি মাইল-চিহ্ন হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বঙ্কিমের পরে এই প্রথম একটি bold departure নিঃসন্দেহে দেখা দিল। কল্পনাবহুল Romance-এর পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ মনোবিশ্লেষণনির্ভর উপন্যাস রচনা করলেন। উপাদান সংগ্রহ করলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই, ইতিহাসের জীর্ণ পুঁথি ঘাঁটবার প্রয়োজন হলো না। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা নতুন গতিপথের সন্ধান পেয়ে ধন্য হলো।

'চোখের বালি'র ঘটনা-বিন্যাসে অসাধারণত্ব কিছু নেই। নারীস্বাতন্ত্র্যের সমস্যা ইতিপূর্বে আমাদের সমাজ জীবনে আলোড়ন এনেছিল। বিধবাদের যে সমস্ত দাবি ইতিপূর্বে বঙ্কিম উপেক্ষা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই 'চোখের বালি'তে নতুন করে যাচাই করলেন। বিনোদিনী রোহিণীরই পরবর্তী সংস্করণ। বঙ্কিম রোহিণীর উপর যেমন বিরূপ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর উপর তেমন নন, কিন্তু তথাপি বিনোদিনীর ন্যায্য মর্যাদা যে রবীন্দ্রনাথও তাঁকে দেননি, একথা সহজেই মনে হয়। আশার সঙ্গেও ভ্রমরের মিল অনেক, দুর্বলতার দিক থেকে মহেন্দ্র আর

গোবিন্দলালে অনেক মিল। এই আশা ও মহেন্দ্রের সংসারে বিনোদিনীর অবস্থানকে কেন্দ্র করেই জটিল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হলো। একদিকে আশা ও মহেন্দ্রের দাম্পত্যজীবনের ঘটনাবলী যৌবন-তাড়িতা বিধবা বিনোদিনীর দেহ-ক্ষুধাকে বাড়িয়ে দিলে, অন্যদিকে মহেন্দ্রও নানা কারণে তার তীব্র আকর্ষণে বশীভূত হয়ে উঠলো। ঘটনাস্রোতকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দিতে গিয়ে মহেন্দ্র-বন্ধু বিহারী এক অদৃশ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়লো ঐ বিধবার সঙ্গে। কিন্তু বিহারী যখন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত, বিনোদিনী তা প্রত্যাখ্যান করে কাশীবাসিনী হতে চলেছে। এখানেই বঙ্কিমযুগের ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ যে তখনও অতিক্রম করে যেতে সাহস পান নি, তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বিহারী রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত নিজস্ব এক আদর্শ চরিত্র।

'চোখের বালি'র দু'বছর পরের রচনা 'নৌকাডুবি'। কিন্তু 'নৌকাডুবি'র শিথিল এবং দৈবনির্ভর ঘটনা-বিন্যাসে মনেই হয়না এটি 'চোখের বালি'র পরে রচিত। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি লিখেছিলেন সম্পাদকের তাড়ায়, 'বঙ্গদর্শনে'র পাতা ভরাবার তাগিদে। অন্তরের কোনো প্রেরণা ছিল না। তার ফলে হলো এই, যে গল্পটি লেখা হতো একশো পাতা কি বড়জোর দেড়শোয়, তাকে টেনে নিতে হলো আরো অনেক দূরে। গল্পটি ফেনিয়ে তোলবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ কৌশলের ত্রুটি করেননি, না হলে রমেশের জীবনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তাকে স্বচ্ছন্দেই মিটিয়ে ফেলা যেতো—গাজিপুর, কাশীতে ছুটোছুটি করবার আবশ্যক হতো না। আবার স্বামীর পরিচয় পাওয়া মাত্র কমলার মন রমেশের প্রতি তার এতকালের প্রীতি-মায়া-অনুভূতি বিসর্জন দিয়ে এক মুহূর্তেই অনভিজ্ঞা অভিমুখী উত্তরমেরু প্রদেশের মতো আকৃষ্ট হলো, আদর্শের দিক থেকে এটা যতোই প্রশংসনীয় হোক না কেন, আধুনিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে অবিশ্বাস্য।

১৯১০ সালে 'গোরা'র আত্মপ্রকাশ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। 'গোরা'ই বাস্তবিক একমাত্র উপন্যাস যা তৎকালিক সমাজ জীবনকে বিশ্বস্তভাবে রূপ দিয়েছে। সেই কারণে আধুনিক কালের বিচারানুযায়ী একেই যথার্থ উপন্যাস বলা যেতে পারে। 'গোরা'র পূর্বে দূরে থাকুক, পরেও আর কোনো উপন্যাস আঙ্গিকের দিক থেকে এত সার্থক হয়েছে কিনা খুবই সন্দেহ। নবজাগ্রত আত্মচেতনা-বোধ তখন ভারতের রাষ্ট্রিক চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। 'গোরা'র আলোচনা ও যুক্তিতর্কে আমরা তারই প্রতিধ্বনি পাই। তা ছাড়া উপন্যাসে 'গোরা'তেই প্রথম যুক্তির প্রাধান্য ঘটে, যা পরবর্তী কালে ঘটনাধর্মকে উপন্যাসের এলাকা থেকে নির্বাসিত করেছে। কিন্তু শুধু যুক্তিতর্কই 'গোরা'কে একখানি সফল করেনি,—তার সাহিত্যমূল্য তার ঘটনা সংস্থানে, নিপুণ চরিত্র চিত্রণে এবং একথাও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' পরবর্তীকালের কয়েকখানি মহৎ উপন্যাসের উৎসরূপে পরিগণিত। 'গোরা'র এক একটি সার্থক চরিত্রের ছায়া অন্যান্য উপন্যাসে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না।

'গোরা'র পর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস একটি নতুন পথে চলতে শুরু করলো। 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাসে ঘটনার বাহুল্য নেই, যেটুকু আছে তাও খুব শিথিল বিন্যস্ত। পাত্রপাত্রীদের মনোরহস্য বিশ্লেষণই এই যুগের উপন্যাসের ধর্ম। চরিত্রগুলোও ঠিক বাস্তবিক নয়—নিখিলেশ, সন্দীপ, এরা প্রত্যেকেই বিশেষ একটি আইডিয়ার বাহক মাত্র। তারা কথা বলে স্বতন্ত্র ভাষায়, তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই, একান্তরূপে তাদেরই উপযুক্ত। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও কথার মারপ্যাঁচ এই উপন্যাসগুলোকে এক নতুন মর্যাদা দিয়েছে। বুদ্ধির দীপ্তি ছাড়াও এ যুগের উপন্যাসে আরো একটা ধর্ম আছে, যাকে বলা যেতে পারে কবিপ্রাণতা।

'গোরা'র প্রায় ত্রিশ বছর পরে (১৯২৯-৪০) রচিত 'যোগাযোগে'র কুমুদিনী সহস্র যুক্তি আর বুদ্ধিদীপ্ত হয়েও কবিতাই এবং এই কবিত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে 'শেষের কবিতা'তে। ক্ষয়িষ্ণু ধনী পরিবারের মেয়ে কুমুদিনীর সঙ্গে নতুন ধনী মধুসূদনের বিবাহিত জীবনে ঘাত-প্রতিঘাতময় দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা হলো 'যোগাযোগে'র মূল বিষয় এবং নরনারীর সম্বন্ধ ও অধিকারের বহু ব্যাপার এতে সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রায় সমস্ত কথোপকথনের মধ্যেই অনাবিল হাস্যরস প্রচ্ছন্ন থাকায় অনবরত সংঘর্ষ ও সংঘাতের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও এই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসটি কখনো ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে নি। তবে প্রভূত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসত্ত্বেও একমাত্র গর্ভস্থ সন্তানের জন্যে কুমুর স্বামীগৃহে ফিরে আসা ছাড়া আর কোনো সমস্যারই কোনো সমাধান এ গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায় না। তা হলেও ভাষার যাদুতে, ঘটনা-বিন্যাসে এবং বর্ণনাভঙ্গিতে 'যোগাযোগ' রবীন্দ্রনাথের এক অনন্য সৃষ্টি।

পরবর্তী উপন্যাসগুলো নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করলেই শোভন হতো, কিন্তু স্বল্পায়তন আলোচনায় এদের যথার্থ পরিচয় দেওয়া যাবে না বলেই এদের সম্বন্ধে সামান্যমাত্র উল্লেখ করেই নিরস্ত হতে হবে। 'শেষের কবিতা'তে কাব্যের আর মনের, বুদ্ধি ও ব্যঙ্গের আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছে। এটিকে নিছক উপন্যাস বলা চলে না, এটি কবির শেষ পর্যায়ের কবিতাও বটে। এর গদ্য কবিতাধর্মী তো নিশ্চয়ই, তা ছাড়াও এতে প্রসঙ্গক্রমে অনেকগুলো কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। কবিতাগুলো নিবারণ চক্রবর্তীর বেনামীতে রবীন্দ্রনাথেরই কবিতা এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের বলে এগুলোকে উপন্যাসের পরিবেশের মধ্যে লেখক 'শেষের কবিতা' নামে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করে রেখেছেন। এর চরিত্রগুলো বিলাতী-ভাবাপন্ন বাঙালী সমাজের এক একটি টাইপ।

'শেষের কবিতা'র পরেও রবীন্দ্রনাথ তিনখানি উপন্যাস রচনা

করেছেন, 'দুই বোন', 'চার অধ্যায়', 'মালঞ্চ'। শেষোক্ত তিনখানি বই-এ রবীন্দ্রনাথ আপনাকে অতিক্রম করতে পারেননি, একথা নিঃসন্দেহ। বুদ্ধির দীপ্তির আর ভাষার ধার অক্ষুণ্ণই আছে, কিন্তু প্রাণের কিঞ্চিৎ অভাব ঘটেছে। 'মালঞ্চে' কবিপ্রাণতার পুনরুজ্জীবনের কিছু সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সাধারণ ঈর্ষ্যাকে অহেতুক প্রাধান্য দেওয়াতে সে সম্ভাবনা ফলবতী হয়নি।

মোটের উপর একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়, সংখ্যায় অল্প হলেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলো সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এবং বিশেষ করে 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' এই তিনখানি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তাঁর উপন্যাসচিন্তার তিনটি স্তর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'চোখের বালি'তে সমাজ-সংসারের কোনো কথা নয়, তাতে ব্যক্তি-জীবনের নানা সমস্যা তরংগায়িত; 'নৌকাডুবি'তে সমাজ-ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার দিকেই যেন লেখকের ঝোঁক, সেখানে স্ত্রী-পুরুষের জটিল সম্পর্ক সংস্কারগত নীতিবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আর সমসাময়িক সমাজ ও ধর্মবোধের বিচারই 'গোরা' উপন্যাসের মূলকথা, সামাজিক ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার মধ্যে মানুষের মুক্তি নেই—ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক মতামত নিয়ে নানা চরিত্রের সংগ্রামের পরিণতিতে ব্যাপক বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশে গোরা ও সুচরিতার মিলনের মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণিত। 'গোরা' উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব আজও তাই তর্কাতীত। প্রধানত কবি হলেও রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসকেও তার প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়েছেন, এবং বারংবার তাতে নতুন এবং সার্থক সম্ভাবনার আমদানি করেছেন, এটা কম কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের নাটক

নাটক বলতে আমরা সচরাচর যে রকমটি বুঝে থাকি, রবীন্দ্রনাথের নাটক ঠিক সে পর্যায়ে পড়ে না। ঘটনা-বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রাণ নয়। সুতরাং পিরাণ্ডেলো নাটকের যে সংজ্ঞা দিয়াছিলেন,—Drama is *action*, Sir, *action*, not confounded philosophy,—সেই কথা মেনে চলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের নাটককে নাটকের শ্রেণীতে ফেলতে অনেকেরই আপত্তি হবে। কেন না, টমসন সাহেবের এ কথায় সকলেই সম্মতি দেবেন যে,—his dramatic work is the vehicle of ideas rather than expression of action. রবীন্দ্রনাথের নাটকে action-এর চেয়ে গীতিধর্মের প্রবলতা বেশি, মতবাদ বড়ো কাহিনীর চেয়ে। তাঁর নাটক 'বাল্মীকি-প্রতিভা' থেকে শুরু করে 'চিত্রাঙ্গদা', 'অরূপরতন' ('রাজা'), 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' পর্যন্ত অনুসরণ করলে এই কথাই সপ্রমাণ হবে।

এর কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁর প্রতিভার অজস্র বহুমুখিতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গীতধর্মীই। তাঁর গানের শেষ নেই এবং এই গানের আশ্রয়ে তাঁর নাট্য-জগৎ স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেছে, যার সঙ্গে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের কোনো মিল নেই। জনসাধারণের জন্যে কবি নাটক রচনা করেন নি, বরং তাঁর নাটকের রসভোগে উপযুক্ত এক শ্রেণীর দর্শক তিনি স্বয়ং সৃষ্টি করে নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল হতেই ঠাকুরবাড়িতে গান-বাজনা ও নাটকের চর্চা চলত। সেই আবহাওয়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও একটি নাটকীয় সত্ত্বা অঙ্কুরিত হয়ে উঠলো,—যার পরিচয় আছে তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি নাটকে।

ইংরেজ সমালোচক এডওয়ার্ড টমসন 'বাল্মীকি প্রতিভা' সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, "The tunes of the Genius of Valmiki are half Indian, half European, inspired by Moore's Irish Melodies." তারই সমর্থন রয়েছে নাট্যকাব্যের 'জীবন-স্মৃতি'তে। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আমাদের বাড়িতে চিত্র-বিচিত্র-করা কবি মুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডিজ ছিল। অক্ষয়বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি।…আইরিশ মেলোডিজ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম।…এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র জন্ম হইল।" তারপরে তিনি বলছেন—"বস্তুত, বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনও স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা, অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই। ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।"

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী গীতিনাট্য 'কাল মৃগয়া' রাজা দশরথের হাতে অন্ধমুনির পুত্রনিধনের মর্মস্পর্শী কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত। নাট্যকার নিজেই তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন যে, বাল্মীকি-প্রতিভার গান সম্বন্ধে নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করে তিনি এই গীতিনাট্যখানি লিখেছিলেন এবং পরে এর অনেকটা 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বলে গ্রন্থাবলীর মধ্যে আর একে পৃথকভাবে স্থান দেওয়া হয়নি। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "বাল্মীকি-প্রতিভা' ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা।" এই পার্থক্যটুকু সত্ত্বেও 'মায়ার খেলা'ও যে রবীন্দ্র-

নাথের প্রথম দুটি গীতিনাট্যের মতোই 'একটা দস্তুরভাঙ্গা গীতি-বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে' লেখা এবং 'সেই সময়কার সংগীতের উত্তেজনা' তখনো পর্যন্ত যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বর্তমান ছিল 'মায়ার খেলায়' তার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করার মতো। এই নাটকে নাট্যোপকরণ তেমন নেই, সংগীতই এর মূল আকর্ষণ। তা হলেও নাট্যকারের একটি বিশেষ বক্তব্য এতে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তা হলো এই, দুঃখ-সাধনার ভিতর দিয়েই যথার্থ প্রেমমিলন সম্ভব এবং মায়ার বন্ধন অতিক্রম করে জীবনকে সার্থক করা যায়।

এর পরেই রবীন্দ্রনাথ এক এক করে আমাদের উপহার দেন কয়েকটি নাট্যকাব্য—'রাজা ও রাণী' (চল্লিশ বৎসর পর গদ্যাশ্রয়ী 'তপতী' নাটকে রূপান্তরিত), 'বিসর্জন' এবং 'মালিনী'। দাম্পত্য প্রেম অপেক্ষা রাজার পক্ষে রাজকর্তব্য পালনই যে বড়ো কথা রাণী সুমিত্রা তাই বার বার রাজা বিক্রমকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন 'রাজা ও রাণী' নাটকে এবং ভালো লাগায় ভোগতৃপ্তি আর ভালোবাসায় ত্যাগধর্মের সার্থকতা এই তত্ত্বটিকে এতে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। 'রাজর্ষি' উপন্যাস থেকে গৃহীত 'বিসর্জন' নাটকটি প্রকাশিত হয় 'রাজা ও রাণী'র এক বছর পরে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। প্রথমটির মতো এ নাটকেও অনেক ট্রাজেডির অবতারণা করা হয়েছে গোঁড়ামি ও সত্যের সংঘর্ষে এবং প্রতাপ ও প্রেমের দ্বন্দ্বে সত্য এবং প্রেমের জয় প্রতিষ্ঠার জন্যে। জগজ্জননীর কাছে ছাগশিশু মানত করে রাণী গুণবতীর সন্তান কামনা পূরণের প্রার্থনা এবং তাতে গুরু রঘুপতির সুদৃঢ় সমর্থনের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের মুখে কী অপূর্ব প্রেমবাণীই না ধ্বনিত হয়েছে—

> বালিকার মূর্তি ধ'রে
> স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন
> জীবরক্ত সহেনা তাঁহার।

জীবহত্যা তাঁর রাজ্যে তাই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন রাজা এবং

তারই ফলে রঘুপতির ক্রোধ ও ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হতে হলো তাঁকে। রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়কে রঘুপতি নানা ছলনায় প্ররোচিত করতে সচেষ্ট হলেন রাজহত্যায়, বললেন, ক্রুদ্ধা দেবী রাজরক্ত চান। আশৈশব পিতৃমাতৃহীন গুরুপালিত ও দেবীর সেবক সত্যাশ্রয়ী জয়সিংহ তা জেনে আত্মবিসর্জনে সকলের ঋণ পরিশোধ করে ত্রিপুরা রাজ্যে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ করে দিলেন। দেওঘর থেকে কলকাতা ফেরবার পথে ঘুমঘোরে এক স্বপ্ন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—সেই স্বপ্নে দেখা মন্দির-সিঁড়ির ওপর পশুবলির রক্ত-চিহ্নই তাঁর 'রাজর্ষি' উপন্যাস তথা 'বিসর্জন' নাটক রচনার প্রেরণা। পরবর্তী কাব্যনাট্য 'মালিনী'ও রচিত হয়েছে এমনি আরেকটি স্বপ্নকে ভিত্তি করে (১৮৯৬)। লণ্ডনে তারক পালিতের গৃহে কবি নিদ্রিত অবস্থায় বিদ্রোহের চক্রান্তমূলক এক নাটকাভিনয় স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং সেই সূত্র ধরেই করুণরসাত্মক ট্রাজেডি 'মালিনী'র আত্মপ্রকাশ। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের বিরোধের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরলালিত চিরন্তন অখণ্ড মানবধর্মের সঙ্গে খণ্ডিত লৌকিক শাস্ত্রধর্মের দ্বন্দ্বকে এই নাটকে রূপায়িত করেছেন। লৌকিকধর্মরক্ষায় সংকল্পবদ্ধ ক্ষেমংকরের আশৈশব বন্ধু সুপ্রিয়, রাজকন্যা মালিনী ও তার প্রচারিত 'অনাদি ধর্মে' আকৃষ্ট হয়ে যখন ব্রাহ্মণদের সভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো 'মিথ্যা তব স্বর্গধাম, মিথ্যা দেবদেবী ক্ষেমংকর···এ মর্ত্যধরণী মাঝে মানবের ঘরে পেয়েছি দেবতা মোর।' তার সে কথা ক্ষেমংকরের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হলো না। এদিকে নবধর্মের প্রতিষ্ঠায় উদ্‌গ্রীব সুপ্রিয় নবধর্মবিরোধী বিদ্রোহী বন্ধু ক্ষেমংকরের সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেওয়ায় তাকে বন্দিত্ব বরণ করতে হয়েছে। সেই বন্দী অবস্থায়ই সে বন্ধু সুপ্রিয়কে হত্যা করে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করলো। কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে চাই প্রেম, ক্ষমা আর ত্যাগ। তাই প্রিয়তম সুপ্রিয়ের হত্যাকারীর জন্যেও

মালিনীকে দেখি ক্ষমা ভিক্ষা করতে, 'মহারাজ ক্ষমো ক্ষেমংকরে'। মালিনী, সুপ্রিয় এবং ক্ষেমংকর এই তিনটি চরিত্রের নাটকীয় দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানবধর্মের মহান আদর্শকে পরম শিল্প-কুশলতায় সাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই ধর্মবোধের নানা অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' প্রভৃতি কাব্যনাট্যগুলোতে যার কথা তিনি নিজেই 'মালিনী'র মুখবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্রমঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে।" কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাট্যসাহিত্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এবং তা হলো সাংকেতিকতা। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি নাটক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এখানে সম্ভব নয়, তবে তাঁর বিভিন্ন রূপক নাটকের মধ্য দিয়ে যে দার্শনিকতার সুরটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা নিতান্তই দরকার।

উচ্ছল গীতিধর্মের ও কাব্যধারার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের নাটকে আরেকটি ধারা প্রবাহিত, সেটি হলো দার্শনিকতার সুর। 'প্রকৃতির পরিশোধে' তিনি আপন অন্তরের সযত্ন লালিত তত্ত্ব 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'কে নাট্যরূপ দিয়েছেন। "একদিকে যতসব পথের লোক, যতসব গ্রামের নরনারী—তা ছাড়া আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অবচেতনতার দিন কাটাইয়া দিতেছি, আর একদিকে সন্ন্যাসী সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীম মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা

তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।" সীমার মধ্যে অসীমের এই মিলনসাধনের পালাকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য-রচনার একটিমাত্র পালা বলে বর্ণনা করেছেন। 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন' প্রভৃতি নাটকে রবীন্দ্রনাথ এক একটি রূপককে নাটকে রূপায়িত করেছেন। এ সব নাটকে action অন্বেষণ করা বাতুলতা। নিখুঁত সৌন্দর্যবোধই এদের প্রাণ, এবং অখণ্ড সৌন্দর্যের অনুভূতি নিয়ে না দেখলে এদের রস উপলব্ধি করা সুকঠিন। রূপক নাটকের পাত্রপাত্রীরা কেউ রক্তমাংসের জীব নয়—তারা এক একটা বিশেষ আইডিয়ার প্রতিরূপ, একান্তই রবীন্দ্রনাথের মনোরাজ্যের অধিবাসী। এরা বাস্তব জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে আহত হয় না—আপনাদের ধারণাকে কথায় প্রকাশ করেই এরা খুশি।

'ফাল্গুনী', রক্তকরবী', মুক্তধারা'তে এই রূপক ধর্মের চরম বিকাশ ঘটেছে। গল্পটা এই নাটকগুলোর মুখোস মাত্র, এদের মধ্যে একটা ব্যঞ্জনা প্রচ্ছন্ন, যা হৃদয়ের অনুভূতির, যা স্পর্শাতীত। অধ্যাত্মরসের নাট্য বলে বর্ণিত 'রাজা'ও তেমনি একটি সার্থক নাটক যাতে বাহির জগৎ থেকে অন্তর জগতে প্রবেশের অভিযান রূপকের সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত। প্রতীক নাট্য 'ডাকঘরে'র মধ্যেও এমনি একটি চমৎকার অধ্যাত্মচিন্তা কাজ করে চলেছে। 'রক্তকরবী'তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসেছেন, সমালোচকের কশাঘাতে এই বর্ণস্ফীত নিষ্প্রাণ আধুনিক সমাজকে কঠোর আঘাত করেছেন রূপকের মাধ্যমে, যদিও নাট্যকার নিজে নাটকটিকে 'সত্যমূলক' বলে অভিহিত করে 'একে রূপকও বলা যায় না' বলে ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন। লোভ এবং বস্তুতান্ত্রিকতা তাঁর কাছে এতটুকু রেহাই পায়নি। এরই মধ্যে নন্দিনীর চরিত্র সুষমা ও মাধুর্যে মণ্ডিত এই দারুণ হানাহানির মাঝখানে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের শ্রেষ্ঠত্বই এইখানে। সাধারণ বস্তুনিষ্ঠ ক্ষুদ্র মানুষের পাশে তিনি একধরণের মহিমময় contrast দাঁড় করিয়েছেন। যেমন তারুণ্য-ধর্মের জয়গানে মুখর 'ফাল্গুনী'র বাউল, 'শারদোৎসবে'র ঠাকুরদা, বা 'প্রায়শ্চিত্ত' (রূপান্তরিত 'পরিত্রাণ') এবং 'মুক্তধারা' নাটকের অহিংস নীতির মূর্ত প্রতীক ধনঞ্জয় বৈরাগী—এরা ছন্নছাড়া কবিপ্রকৃতির,—এদের চরিত্রের মধ্য দিয়েই কবি এই কদর্য সংসারের উপরে পরিণত সুন্দরের আভাস দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে সাংকেতিক নাটক রচনা করেছেন তার কারণ বোধ করি এই 'যেখানে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত খুব বেশি, জগৎ ও জীবনের উত্থানপতনে তরঙ্গমালা যেখানে ঠেলাঠেলি করিয়া মরিতেছে, শতকণ্ঠের কোলাহল যেখানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে মূক হইয়া গিয়াছেন।' এই কলহের মধ্যে তাঁর অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠেছে, 'হেথা নয়, হেথা নয়'—রবীন্দ্রনাথ শান্তি ও নীরবতার মধ্যে সৌন্দর্যের অন্বেষণ করেছেন। সমন্বয়ের আদর্শের মধ্যেই সেই আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যের সন্ধান মেলে—'অচলায়তনে' গতি ও স্থিতির বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত উভয়ের জয়-পরাজয়ের মাধ্যমে তিনি সেই আদর্শকে রূপ দিয়েছেন। 'আমার মন যে কাঁদে আপন মনে, কেউ তা জানে না।'—প্রতীকের সাহায্যে সমন্বয় আদর্শের জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের সেই কান্নাকেই তুলে ধরেছেন। যে কারণে তিনি মূলত গীতি-কবি এবং সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা, সেই কারণেই তিনি রূপক নাট্যে অতুলনীয়। 'তাসের দেশ'ও একটি সফল প্রতীক-নাট্য, কিন্তু তার বিশেষ আকর্ষণ কাল্পনিক উদ্ভটতায় যার সাহায্যে নাট্যকার চিরাচরিত কতগুলো কুসংস্কারকে বিদ্রূপের কঠোর কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন, অর্থহীন শাস্ত্রানুগত্যের বিরুদ্ধে কঠিন শ্লেষ বর্ষণ করেছেন।

রূপক নাট্যের সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্যে অভিনয় নিষ্প্রয়োজন,

পাঠই যথেষ্ট। কারণ আগেই বলেছি শান্তি ও নীরবতার মধ্যে সৌন্দর্যের সন্ধান। "Passion does not move at such headlong speed as in Shakespeare's day, so that we present not the actions themselves but the psychological states which cause them." অর্থাৎ এক কথায় রূপক নাট্য no-plot play.

সোজা ভাষায় যাকে আমরা action বলি, তার ইঙ্গিতটুকু মাত্র রূপক নাটকে প্রাপ্তব্য। ভাষাও অনেকস্থানে হার মেনেছে, আভাষই সেখানে একমাত্র ভরসা। বাহ্য ঘটনা এখানে নিতান্তই গৌণ। এ নাটকের বাণী 'বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।'

এর পরেও যদি কোন উৎসাহী 'নাটক'-ভক্ত আপত্তি তোলেন; তবে নাটক নাম রবীন্দ্র-নাটকের সম্পর্কে ব্যবহারের দাবি আমরা প্রত্যাহার করতে রাজি আছি। নামে কিছু আসে যায় না, গোলাপের গন্ধ অন্য নামেও একই রকম মনোহর হতো। রবীন্দ্রনাথের নাটকে যে একটা বিশ্বজনীন সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে তা একাধারে ethical এবং aesthetical। বিষয়বস্তুই তাকে অম্লান নিত্যতা অর্পণ করবে, তথাকথিত 'নাটকীয়' গুণ তাতে থাক বা না থাক। এমন কি কৌতুক নাট্য ও প্রহসন রচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের এ কৃতিত্ব অনন্য। শুধুমাত্র বিষয় নির্বাচন এবং পরিবেশন বৈশিষ্ট্যের জন্যেই তাঁর 'হিং টিং ছট্', 'জুতা আবিষ্কার', 'গোড়ায় গলদ', 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি', 'স্বর্গীয় প্রহসন', 'নূতন অবতার' এবং পরবর্তীকালের 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' এবং 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ ও সমালোচনার ব্যাপকতা বেশি নেই। আজ আমরা বাংলায় প্রবন্ধ সাহিত্যের যে রূপ প্রত্যক্ষ করছি বঙ্কিম তার ভিত্তিস্থাপন করে গিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথই সেই ইমারতকে সম্পূর্ণতা দান করেন।

প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। সমসাময়িক সমস্যা কখনো তাঁর হৃদয়-দুয়ারে ব্যর্থ করাঘাত করে-নি। 'স্বদেশী সমাজ,' 'ভারতবর্ষ,' 'শিক্ষার হেরফের' প্রভৃতি প্রবন্ধই তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে উচ্ছাসের চেয়ে যুক্তির একটা রসোচ্ছল সুদূরগামিতাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বস্তুত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ সাহিত্যের স্বরূপই এই এবং এই ভাবসমৃদ্ধ রসোচ্ছলতার জন্যেই তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত, ইংরেজিতে যাকে বলে Literature of power—যুক্তিতর্কঘন সিদ্ধান্তমূলক Literature of power নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বহুগামিতা বিস্ময়কর। ধর্ম, দর্শন, সমাজ, শিক্ষা, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্যদর্শন—কোন বিষয় নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবেন নি? কিন্তু শুধু বস্তু নয়, প্রকাশভঙ্গির অপূর্বতায় এবং কবিমানসের গীতিধর্মিতায় রবীন্দ্রনাথের এক একটি প্রবন্ধ এমন রসমণ্ডিত ও অনবদ্য হয়ে উঠেছে যে বিশ্বসাহিত্যে সে সবের তুলনা মেলা ভার। তাঁর চিঠিপত্রও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো প্রবন্ধ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু সংখ্যায় তারা এত বেশি এবং এত বিচিত্র তাদের বিষয় যে, একটি পৃথক বিভাগেই রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা সমীচীন।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ যখন সাময়িকপত্র পরিচালনা ও সম্পাদনায়

বিশেষভাবে অভিনিবিষ্ট সেই সময় জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে তাঁকে বহু প্রবন্ধ রচনা করতে হয়। তার মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলোই সম্ভবত দেশবাসীর সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে লেখা 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ তখনকার প্রবীণ শিক্ষাব্রতীদের চমৎকৃত করেছিল এবং শিক্ষা বিষয়ে কবির সেই সকল মতামতের মূল্য এখনও কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। "অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না-মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হয় না।"—নিজের জীবনে তিনি এ-সত্যকে যে-ভাবে প্রমাণিত করেছিলেন অন্য আর সকলের ক্ষেত্রেও তিনি সেই সত্যের প্রতিষ্ঠাকে কামনা করেছিলেন এবং নিজের জীবনের বেদনা থেকেই লিখেছিলেন—"বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমনি করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না।···সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবলই লাঙ্গল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলা ভাঙা, কেবলই ঠেঙা লাঠি, মুখস্ত এবং একজামিন—আমাদের এই মানবজীবন আবাদের পক্ষে, আমাদের এই দুর্লভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।" ইস্কুলে দশটা-চারটের লেখাপড়ায় যে সত্যকার শিক্ষালাভ সম্ভব নয় কবি সে-কথাটা আরো জোরালো ভাষায় প্রকাশ করেছেন 'শিক্ষা সমস্যা' প্রবন্ধে। "সংসারে কৃত্রিম জীবন-যাত্রার হাজার রকমের অসত্য ও বিকৃতি যেখানে প্রতিমুহূর্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে সেখানে ইস্কুলে দশটা-চারটের মধ্যে গোটাকতক পুঁথির বচনে সমস্ত সংশোধন করিয়া দিতে হইবে ইহা আশাই করা যায় না। ইহাতে কেবল ভুরি ভুরি ভানের সৃষ্টি হয় এবং নৈতিক জ্যাঠামি, যাহা সকল জ্যাঠামির অধম, তাহা সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া দেয়।" এ কথা কে অস্বীকার করবে? গুরু-শিষ্যের সুন্দর সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে শিক্ষার সুনির্মল

স্রোতধারা বয়ে চলবে, এটাই কাম্য। রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' প্রবন্ধে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষাদর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে সে কথাই ব্যক্ত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, "প্রাচীন আদর্শ অনুসারে আমার ছিল এই মত, যে শিক্ষাদান ব্যাপারে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়াটা গুরুর আপন সাধনারই প্রাচীন অঙ্গ। বিদ্যার সম্পদ যে পেয়েছে তার নিজেরই নিঃস্বার্থ দায়িত্ব সেই সম্পদ দান করা।" অবশ্য বিদ্বান মাত্রই যে গুরু হবার যোগ্য তা নয়, তার জন্যে বিশেষ বিশেষ গুণ থাকা দরকার। "গুরুর অন্তরের ছেলেমানুষটি যদি শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যায় তাহলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।…যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণ-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্ব-শ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা যেন প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী, তবে থাবার আড়ম্বর দেখে নির্ভয়ে যে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না।"

শুধু শিক্ষকের দায়িত্ব বর্ণনা করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি, শিক্ষার ব্যাপারে পিতামাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্বও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। 'শিক্ষা সমস্যা'র এক স্থানে বলেছেন— "ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পর দিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে। সে সম্পূর্ণরূপে মানবসন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে।…শিশুরা, যাহারা ধুলামাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রৌদ্র বৃষ্টি বায়ুকে প্রার্থনা করে, নিজের সমস্ত

ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে যাহাদের সুখ তাহাদিগকে চেষ্টা দ্বারা বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের মতো অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার দ্বারাই সম্ভব—সেই পিতামাতার হাত হইতে এই নিরপরাধগণকে রক্ষা করো।” আমাদের দেশে বহু শিশুই যে পিতামাতা ও অভিভাবকদের আদরে নষ্ট হয়ে যায় সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কি ভাবে যে বয়স্করা ছোটদের ক্ষতি করে থাকে ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কবি লিখেছেন—“অনায়াসে প্রয়োজনের জোগান দেওয়ার দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আছুরে করে তোলা তাদের ক্ষতি করা। সহজেই তারা যে এত-কিছু চায় তা নয়, তারা আত্মতৃপ্ত ; আমরাই বয়স্ক লোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদের বস্তুর নেশাগ্রস্ত করে তুলি।” সর্বাংশে সত্য কথা।

‘ভারতী’র পাতায় ১২৮৮ সালের শ্রাবণ থেকে ১২৮৯ সালের বৈশাখ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে টুকরো রচনাগুলি প্রকাশিত হয়—তার নাম ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’। এতে ‘বসন্ত ও বর্ষা’, ‘প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে’র মতো গভীর ভাবের প্রবন্ধ যেমন আছে, তেমনি ‘শূন্য’, ‘স্ত্রৈণ’, ‘জমাখরচ’ ইত্যাদি হালকা ভাবের এমন কি ‘দয়ালু মাংসাশী’র মতো রাজনৈতিক প্রবন্ধও স্থান পেয়েছে। শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। কান্দাহার ও ট্রান্সভাল প্রসঙ্গে কবি তীব্র উষ্মা বোধ করে বলেছেন: “উদ্ভিদভোজী ভারতবর্ষকে ইংরেজ শ্বাপদেরা দিব্য হজম করিতে পারিয়াছেন।” ‘আদর্শপ্রেম’ প্রবন্ধে কবি বলেছেন: “প্রকৃত ভালবাসা দাস নহে, সে ভক্ত ; সে ভিক্ষুক নয়, সে ক্রেতা। আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন, মহত্ত্বকে ভালোবাসেন।”

‘বসন্ত ও বর্ষা’ প্রভৃতি প্রবন্ধ মানবমনের ও ঋতু বদলের নিবিড় সংস্পর্শজাত দার্শনিক বিচারমূলক। বর্ষা ও বসন্তের তুলনা করে

কবি তাই বলেছেন—"বসন্ত উদাসীন, গৃহত্যাগী। বর্ষা সংসারী, গৃহী।"

'বিবিধ প্রসঙ্গে'র সর্বশেষ রচনা সমাপনে কবি গ্রন্থটির মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছেন—"ইহা, একটি মনের কিছু দিনকার ইতিহাস। ইহাতে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে সেগুলি আমার চিরগঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রায় শুরু থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অমৃতলাল বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির তীব্র সমালোচনা ও কঠিন ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেকটা উপেক্ষার মনোভাব নিয়েই তিনি এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিরুত্তর রয়ে গেছেন—উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। যে বস্তুবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল এক সময়ে স্পষ্টবাদিতার মোহে আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথকে কাব্যে ও সাহিত্যে অস্পষ্টতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি আমদানীর অভিযোগে যথেচ্ছভাবে আক্রমণ করেছিলেন, সেই বয়ঃকনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলালকে রবীন্দ্রনাথই 'বঙ্গদর্শনে'র মাধ্যমে সাধারণ পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। একের পর এক দ্বিজেন্দ্রকাব্যকে অভিনন্দিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—'আর্য-গাথা' (দ্বিতীয় খণ্ড), 'আষাঢ়ে' এবং 'মন্ত্র' তাঁর প্রশংসায় প্রচুর জনসমাদর লাভ করলো। 'মন্ত্র' সম্বন্ধে তিনি যে সমালোচনা-প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন তা শুধু প্রশংসা-বাক্যই নয়, সাহিত্য সমালোচনা রীতির তা এক দিগ্‌দর্শন। এই প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিকৃতি সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন—"এই কাব্যে (মন্ত্র) যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে। সে সাহস কি শব্দ নির্বাচনে, কি ছন্দরচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ।...কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষ্যান্বিত

নয় রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন—দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্রে তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য, বিস্ময় কখন যে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই।”

'সাহিত্যের স্বরূপ' বর্ণনায় কবি লিখেছেন—“পাড়ায় মদের দোকান আছে সেটাকে ছন্দে বা অছন্দে কাব্যরচনায় ভুক্ত করলেই কোনো কোনো মহলে সস্তা হাততালি পাওয়ার আশা আছে। সেই মহলের বাসিন্দারা বলেন, বহুকাল ইন্দ্রলোকে সুধাপান নিয়েই কবিরা মাতামাতি করেছেন, ছন্দবন্ধে শুঁড়ির দোকানের আমেজ-মাত্র দেননি—অথচ শুঁড়ির দোকানে হয়ত তাঁদের আনাগোনা যথেষ্ট ছিল। এ-নিয়ে অপক্ষপাতে আমি বিচার করতে পারি—কেননা আমার পক্ষে শুঁড়ির দোকানে মদের আড্ডা যত দূরে ইন্দ্রলোকের সুধাপান সত্য তার থেকে কাছে নয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পরিচয়ের হিসেবে। আমার বলবার কথা এই যে, লেখনীর জাদুতে কল্পনার পরশমণি স্পর্শে মদের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে, সুধাপানসভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই। অথচ দিনক্ষণ এমন হয়েছে যে ভাঙা ছন্দে মদের দোকানে মাতালের আড্ডার অবতারণা করলেই আধুনিকের মার্কা মিলিয়ে যাচনদার বলবে, হাঁ কবি বটে, বলবে, একেই তো বলে রিয়ালিজম্।—আমি বলছি বলে না। রিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে এরকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত বেশি চলিত হয়েছে। আর্ট এত সস্তা নয়। ধোবার বাড়ির ময়লা কাপড়ের ফর্দ নিয়ে কবিতা লেখা নিশ্চয়ই সম্ভব, বাস্তবের ভাষায় এর মধ্যে বস্তাভরা আদিরস, করুণ রস এবং বীভৎস রসের অবতারণা করা চলে। যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুই বেলা বকাবকি চুলোচুলি তাদের কাপড় দুটো একঘাটে এক সঙ্গে আছাড় খেয়ে নির্মল হয়ে উঠেছে, অবশেষে সওয়ার হয়ে চলেছে একই গাধার পিঠে, এ বিষয়টা নব্য চতুষ্পদীতে দিব্য মানানসই হতে পারে। কিন্তু বিষয় বাছাই নিয়ে

তার রিয়ালিজম নয়, রিয়ালিজম ফুটবে রচনার জাদুতে। সেটাতেও বাছাইয়ের কাজ যথেষ্ট থাকা চাই, না যদি থাকে তবে অমনতর অকিঞ্চিৎকর আবর্জনা আর কিছুই হতে পারে না। এ নিয়ে বকাবকি না করে সম্পাদকের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, প্রমাণ করুন রিয়ালিষ্টিক কবিতা কবিতা বটে, কিন্তু রিয়ালিষ্টিক বলে নয়—কবিতা বলেই।”

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্য ও সংবাদ সাপ্তাহিক ‘হিতবাদী’ প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্য-সম্পাদক নিযুক্ত হন। এখানেই তাঁর ছোটগল্প রচনায় হাতেখড়ি হলেও যে কয়মাস তিনি এই সাপ্তাহিকখানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই সময়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে ‘অকালবিবাহ’ প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফরমায়েসে সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি হয় না এবং নির্দিষ্ট কোনো ‘উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এইরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়’—এই কথা স্বয়ং ঘোষণা করলেও উদ্দেশ্য ও উপদেশমূলক রচনাকে সাহিত্য-স্বীকৃতিদানে কবির কুণ্ঠা ছিল। এ নিয়েই ‘হিতবাদী’ পরিচালকদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে এবং তিনি তাঁর সাহিত্য বিভাগীয় সম্পাদকপদে ইস্তফা দেন। এই বিরোধের এবং সাহিত্য বিষয়ে কবির এই মনোভাবেরই ছায়াপাত ঘটেছে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ‘সাহিত্য’ মাসিকপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিত ব্যঙ্গ-শ্লেষাত্মক ‘লেখার নমুনা’ এবং ‘সাধারণ সাহিত্য’ নামক দুইটি সমালোচনা প্রবন্ধে। ‘সাধনা’ পত্রিকা প্রকাশিত হলে তাতে সাহিত্য ও ভাষা বিষয়ে কবির অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়। রসজ্ঞ বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে এ-সময়েই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং সে সব প্রসঙ্গ ‘সাধনা’র মাধ্যমে পাঠকদের কাছে পরিবেশিত হতো। লোকেন্দ্রনাথের ‘সাহিত্যের উপাদান’ শীর্ষক পত্র-প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ‘সাহিত্যের প্রাণ’ প্রবন্ধে

যে-সমস্ত মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশ করলেন তা চিরদিনের স্মরণীয়। "সমগ্র মানুষকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ।...মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে; তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকবে না কেবল সাহিত্যে থাকবে। সঙ্গীতে চিত্রে বিজ্ঞানে সমস্ত মানুষ নেই। এই জন্যেই সাহিত্যের এত আদর। এই জন্যেই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার।" অপর এক প্রবন্ধেও 'মানুষকে প্রকাশ' করাই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য, 'আর সমস্ত উপলক্ষ' বলে কবি যে মত প্রকাশ করেছিলেন তা একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত বলেই স্বীকৃত। 'সাধনা' যুগের সাহিত্য ও ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটিকে ছন্দ বিষয়ে তাঁর পরবর্তী বহু রচনার মুখবন্ধ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধেই তিনি প্রথম বললেন, "বাংলা শব্দের মধ্যে...এই ধ্বনির অভাববশতঃ বাংলায় পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ, গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথার যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়। যতক্ষণ চিত্ত না জাগিয়া উঠে সঙ্গীত ছাড়ে না। এই জন্য প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে গান ছাড়া আর কিছু নাই বলিলেই চলে।" বিদেশের কাছে ঋণ স্বীকারে কবির কোনো কুণ্ঠা ছিল না। "বঙ্কিম আনলেন সাত সমুদ্রপারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। সেই হইতে বাংলা সাহিত্যের মুক্তি।" তাঁর মন্তব্যেরই কবি সুন্দর করে বিশ্লেষণ করেছেন সবুজপত্রের সোনার কাঠিতে। লিখেছেন—"বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিসকে মুক্তি দিয়েছে তা তো বিদেশী নয়—সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফল হয়েচে এই যে, যে বাংলা ভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইতো না এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করচে ও গৌরব

করচে। অথচ যদি ঠাহর করে দেখি তবে দেখতে পাব গদ্যে-পদ্যে সকল জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেককালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদলে গেছে।" শুধু সাহিত্য নয়, এমনি করেই রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত, চিত্রকলা, বিজ্ঞান, প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত 'ছবির অঙ্গ' প্রবন্ধে তিনি যে দার্শনিক তত্ত্বটি তুলে ধরেছেন তাতে কবির জীবনধর্মের মূল সুরটিই ধ্বনিত হয়েছে। "মানুষ তার বিজ্ঞানে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে যখন বহুর মধ্যে এককে পায় তখন সৌন্দর্যকে পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মানুষ বহুকে লইয়া তপস্যা করিতেছে এককে পাইবার জন্য।" আর্টের বিচারে এমন বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব।

ডায়েরি জাতীয় এক ধরণের রচনাও আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যে দেখতে পাই। এর মধ্যে 'পঞ্চভূতের ডায়েরি' এক বিচিত্র পদ্ধতির রচনা। ডায়েরি বলে অভিহিত হলেও এতে কবির আত্মপরিচয়ের সন্ধান করলে ভুল করা হবে বলে কবি নিজেই পাঠকদের সতর্ক করে দিয়েছেন এবং 'সাধনা' পত্রিকার ২য় বর্ষের আরম্ভে 'পঞ্চভূতের ডায়েরি' প্রকাশ শুরু করেই লেখক মুখবন্ধে বলে নিয়েছেন, "শাস্ত্রমতে পঞ্চভূতের সমষ্টিই জগৎ। মানুষও তাই। প্রত্যেক মানুষই প্রায় পাঁচটা মানুষ মিলিয়া। ভিতরেও পাঁচটা, বাহিরেও পাঁচটা। কোনো মানুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে।··কিন্তু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে গুটিকতক বিশেষ বিশেষ মানুষ বিশেষরূপে সংলগ্ন হইয়া একটি বিশেষ ঐক্য নির্মাণ করে। তাহার অসংখ্য আলাপী আত্মীয়দের মধ্যে সেই কয়েকটি লোকই যেন তাহার সীমানা নির্দেশ করিয়া দেয়।···রচনার সুবিধার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে কেবল

পাঁচ জনকে লওয়া যাক এবং তাহাদের পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।" ভূমিকায় বর্ণিত এই পঞ্চভূতের সঙ্গে 'আমি' যুক্ত হয়ে মোট ছয় জনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এই ডায়েরিতে প্রায় তিন বছরে রবীন্দ্রনাথ ১৬টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তার মধ্যে নরনারী, মনুষ্য, মন, সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, কাব্যের তাৎপর্য, কৌতুকহাস্যের মাত্রা, ভদ্রতার আদর্শ, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

'নেশন' সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিত রেঁণার (Renan) মত উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। "নেশন শব্দের যথার্থ অর্থ নির্দেশ করা কঠিন ; উহা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাষ্ট্র, ভাষা নিরপেক্ষ একটি আধ্যাত্মিক ভাব মাত্র।" রেঁণার মতে, অতীতে সকলে ত্যাগ স্বীকার করে একীভূত নিবিড় ভাব পোষণ করত—তাই হল নেশন। সকলে মিলে এক জীবন বহন করার ইচ্ছার নাম ন্যাশনালিজম। নেশনের প্রত্যেকে ন্যাশনাল স্বার্থ রক্ষার জন্যে ব্যক্তিক স্বার্থ বিসর্জন দিত বলে তা সজীব। ভারতীয় ভাষায় এর প্রতিশব্দ তেমন নেই। ভারতে তেমনি একটি একীভূত হবার ভাব আছে—তা 'সমাজ'। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্মমত ও আচার-বিহার নিয়ে হিন্দুর 'সমাজ' গঠিত। হিন্দু সমাজ বহু ও বিচিত্রকে এক করে নিজে প্রাণবান হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে। এখন সেই প্রাণ ও চেতনা নেই। প্রাচীন ভারতের সেই আদর্শকে সঞ্জীবিত করলে যথার্থ হিন্দুত্ব রক্ষিত হবে। 'নৈবেদ্যে'র কবি এই ভাবটি ব্যক্ত করেছেন। 'বঙ্গদর্শনে' (শ্রাবণ, ১৩০০) রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'হিন্দুত্ব' প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন।

"বর্ণাশ্রম ধর্মই" কবির মতে "হিন্দু সমাজের ঐক্যভিত্তি।" অথচ 'হিন্দুর একনিষ্ঠতা' প্রবন্ধে কবি বলেছেন যে, এই বর্ণাশ্রম ধর্ম শাশ্বত মানবধর্মকে আঘাত করেছে, কালে বর্ণাশ্রম ধর্মের বিপদ ঘনিয়েছে।

'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রমের যে ব্যাখ্যা করলেন, তা বর্তমানে কোনো হিন্দুর পক্ষে গ্রহণ করা দুঃসাধ্য। কারণ তা যথার্থ প্রাচীন ভারতের মূল আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে ত্যাগ, সংযম, নিরাসক্তি ও নির্লোভ সবই আছে। কিন্তু পশ্চিমের ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করতে ভুল করেছেন। উপসংহারে ঋষিকবি বলেছেন, ব্রাহ্মণগণকে ভারতবর্ষ তার তপোবনের ধ্যানলোকে, জ্ঞানের জগতে আহ্বান করছে। আর যারা বৈশ্য ও ক্ষাত্রব্রতে ইচ্ছুক তাঁরা যেন প্রকৃতির বা উত্তেজনার অনুরোধে ও পথে না আসেন, "ধর্মের অনুরোধেই অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত ফলকামনায় একান্ত আসক্ত না হইয়া প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হউন।"

'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' তাঁর এই চিন্তাধারার উৎসমুখের সৃষ্টি, তাঁর আদর্শের মূর্তি, তাঁর জীবনের পরীক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেও ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডী ধীরে ধীরে কেটে ফেলেন। তাঁর কাছে স্বাদেশিকতার উগ্রতা যেমন ব্যর্থ, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের গোঁড়ামিও অর্থহীন। জীবনধারণের পক্ষে সমাজ নিতান্তই প্রয়োজনীয়, কিন্তু ধর্ম দেশ ও সমাজের উর্ধ্বে। 'গোরা' উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য এই। 'শান্তিনিকেতন' ১৩শ খণ্ডে মোটামুটি এই সব সমাজবিষয়ক বিবিধ চিন্তা নিয়ে কবি আলোচনা করেছেন।

কবির 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধটি ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দের আষাঢ়ে রচিত। তিনি লক্ষ্য করেছেন সমাজের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কেমন জটিল হয়ে উঠেছে। কবির মতে এ ধরণের 'আত্মীয় বিদ্বেষী' ব্যাপারে জাতির ভবিষ্যৎই অন্ধকার। এই বিদ্বেষের পেছনে রয়েছে সাম্প্রদায়িক শক্তিমত্ততা বা Party Politics। কবি তাই 'ধর্মনিরপেক্ষ ও শ্রেণীনিরপেক্ষ সমাজ স্থাপনে'র আদর্শকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

কবির 'ভারতীয় বিবাহ' (১৯২৫) প্রবন্ধটি সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বিবাহের ন্যায় জটিল সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে কবির আলোচনাগুলোতে তিনি কোথাও কর্তব্যবুদ্ধিকে বিসর্জন দেন নি।

কবি বিবাহ প্রথার ইতিহাস আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে এদেশেও ভাবাবেগ ও অন্যান্য নানাপ্রকার উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়-যুক্ত বিবাহপ্রথা চালু ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় স্মৃতিকার বিবাহকে ভাবাবেগের পর্যায় থেকে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সরিয়ে এনেছেন। (সমাজ)

বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন মাতৃরূপে ও প্রেয়সীরূপে। মাতৃরূপ ভবিষ্যতের জন্যে, বর্তমানের জন্যে প্রেয়সী-রূপ। "প্রেয়সীরূপে তার সাধনায় পুরুষের সর্বপ্রকার উৎকর্ষ চেষ্টাকে প্রাণবান করে তোলে।" কিন্তু ব্যক্তিগত ভোগের ক্ষেত্রে সীমিত রাখলে নারীর আসল রূপ প্রকাশ পাবে না। কবির মতে নারীর এই অমর্যাদাই তার বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। কালিদাসের কুমারসম্ভব রচনার মধ্যে কবি তৎকালীন সামাজিক প্রজনন-পুষ্টতার ইঙ্গিত উদ্ধার করে নতুন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, কুমার-সম্ভবের কুমার-জনন কেবলমাত্র বৈবাহিক স্থৈর্য ও প্রশান্তির দ্বারাই সম্ভব।

'হিতবাদী' পত্রিকায় 'অকাল বিবাহ' প্রবন্ধে কবি বলেছেন—"অকাল বিবাহ বলিতে যে মেয়েদের অসময়ে বিবাহ বুঝায় তা নয়, পুরুষদের পক্ষেও অকালবিবাহ সম্ভব।" বালক বয়সে, কিংবা আর্থিক স্বাধীনতা লাভ না করে কিংবা উপার্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ করা সামাজিক অপরাধ। একান্নবর্তী পরিবারে এটি অপরাধ বলে গণ্য না হলেও সাধারণত এ কথা সত্য।

নিজে জমিদার হয়েও, জমিদারিপ্রথা যে আমাদের সমাজের পক্ষে অভিশাপ ছাড়া কিছুই নয়, এ কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। 'জমিদার জমির জোঁক, সে parasite—

পরাশ্রিত জীব'— এই জন্যে তিনি অন্তরে কম বেদনা অনুভব করেন নি। তিনি নিজেই বলেছেন—"আমার জন্মগত পেশা জমিদারী, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি, এই কারণেই জমিদারীর জমি আঁকড়ে থাকতে আমার প্রবৃত্তি নেই, এই জিনিসটির 'পরে আমার একান্ত শ্রদ্ধার অভাব···আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্বগ্রহণ না করে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায়, আর অন্যেরা মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষ নেই, গৌরবও নেই।"

জমিদার হয়ে জমিদারি প্রথার এমন কঠোর সমালোচনা করা শুধু রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

'ছবি ও গানের' যুগে তরুণ রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত গদ্য রচনা করেছেন তাতে সামান্যকে অসামান্য এবং গুরুতর বিষয়কে লঘু করে দেখাবার প্রয়াস সুস্পষ্ট। 'আলোচনা' নামক গ্রন্থে সেই সময়ে প্রকাশিত ছোট ছোট প্রবন্ধগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছেলেমানুষী অবান্তরতার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য-বিষয়ক নানা প্রশ্ন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা সমস্যায় তরুণ লেখকের মন তখন আলোড়িত। সব বিষয়েই নিজের মতামত প্রকাশের জন্যে তখন তিনি ব্যাগ্র। কিন্তু সেই ব্যাগ্রতা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রূপ পেয়েছে লঘু ও অপরিণত চপল আলোচনায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাউলের গান' 'লেখাকুমারী' ও 'ছাপাসুন্দরী' (প্রভাত সঙ্গীত প্রকাশের পর), 'গোঁফ এবং ডিম', 'তার্কিক', 'অনাবশ্যক', 'তৃতীয় পক্ষ', 'চেঁচিয়ে বলা' প্রভৃতি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এমন সব আলোচনার মধ্যেও সময় সময় খাঁটি ও গভীর কথা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। যেমন 'বাউলের গান' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"এখনো আমরা বাঙালীর ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাংলা নাই, ইংরেজী ব্যাকরণেও বাংলা নাই, বাংলা ভাষা বাঙালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে।" তারপরে আবার লিখেছেন—"ভাবের ভাষার অনুবাদ চলে না।···ভাবের ভাষা হৃদয়ের স্তন্যপান করিয়া, হৃদয়ের সুখদুঃখের দোলায় দুলিয়া মানুষ হইতে থাকে। সুতরাং তাহার জীবন আছে। ছাঁচে ঢালিয়া তাহার একটা নির্জীব প্রতিমা নির্মাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না ও হৃদয়ের মধ্যে পাষাণভারের মতো চাপিয়া পড়িয়া থাকে।" এ যুক্তি অকাট্য বৈকি! মারমুখো সমালোচকদের লক্ষ্য করে এবং তাঁদের আচরণের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ 'গোঁফ এবং ডিম' আর 'তার্কিক' প্রবন্ধ দু'টি রচনা করেন। তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলনের সে যুগ। কিন্তু তথাকথিত রাজনৈতিক উত্তেজনাসৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের কোনো সায় ছিল না এবং এ কাজে তদানীন্তন নায়কেরা যে সব পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তাতেও তাঁর কোনো সমর্থন ছিল না। তখনকার রাজনীতি বিষয়ক রবীন্দ্র-প্রবন্ধাবলীতে কথার বাহুল্য বা যুক্তির চাপল্য যতই থাক না কেন রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদের মূলসূত্রের সন্ধান মেলে সে সব লেখায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মধ্যে একটা বিরোধ রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন—সেটি তাঁর নেশন ও ন্যাশনালিজম প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ধর্ম থেকে ধার্মিকতার দিকে ধাবিত হয়ে প্রাচ্য যেমন তার আদর্শকে হারিয়েছে, মনুষ্যত্বের চেয়ে রাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে পাশ্চাত্ত্যও বিনষ্টির পথে এগিয়ে চলেছে, এই ছিল তাঁর মত।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের সমাজজীবনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার পক্ষপাতী বটে, কিন্তু এদেশে তিনি ইউরোপীয় জাতিপ্রেম বা ন্যাশনালিজম আমদানির ঘোর বিরোধী। তিনি রণোন্মত্ত পাশ্চাত্ত্যকে অনেকটা ঋষির কণ্ঠে এই কথা শুনিয়েছিলেন যে,

"ন্যাশনালিজম্ পৃথিবীতে শান্তিসুখ আনিবে না।" তারও বিশ বছর পরে সভ্যতার সংকটে কবি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চরম দুর্গতির কথা বিশ্বজনকে শুনিয়েছেন।

বিশ শতকে ইউরোপীয় শিক্ষাগুণে নেশন ও ন্যাশনালিজম কথা দু'টি এদেশে ব্যাপকভাবে চালু হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এদের বীভৎস রূপটিকে দেখিয়েছেন। ভারতের কাম্য শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, তার সঙ্গে আত্মার স্বাধীনতা বা মুক্তি। "আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না।" গ্রীক ও রোমান সভ্যতার বিনষ্টির মূলেও এই তথাকথিত 'রাষ্ট্রীয় স্বার্থ' ছিল। হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; তাই পরাধীন কিংবা স্বাধীন—বাহিরে যাই থাকি না কেন হিন্দু সভ্যতাকে সঞ্জীবিত করার বাসনা আমরা ত্যাগ করতে পারি না, রাজনীতি বিষয়ে রবীন্দ্রচিন্তার এই ছিল মূল কথা।

রবীন্দ্রনাথ মূলত ছিলেন মানবধর্মের পূজারী। তাঁর কাব্যে, নাটিকায়, সর্বত্র সেই মানবধর্মের জয়গান বারবার ধ্বনিত হয়েছে। এই গ্রন্থেও নানাস্থানে সে-বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তবু বিশেষ করে তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের কথা উল্লেখ না করলে প্রবন্ধ-সাহিত্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিবার্ট লেকচারে' কবি Religion of Man নামে যে-ভাষণ দেন তারই ভিত্তিতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে কবি দেখিয়েছেন যে সকল লৌকিক ধর্মের উর্ধ্বে যে সর্বব্যাপক মানবধর্ম সেটাই হল মূলধর্ম।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য প্রকৃত চিন্তাসাহিত্য, প্রকৃত মানুষ গড়ার কাজে তার জুড়ি নেই। কবিতায়, গল্প-উপন্যাসে, নাটকে ও গানে তাঁর দান যত অসামান্যই হোক না কেন, আমার তো মনে হয় আমাদের জাতীয় ভাণ্ডারে প্রবন্ধ সাহিত্যই কবির সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের লেখা গানের একটা হিসাব পাওয়া গেলেও তাঁর লেখা চিঠি-পত্রের হিসাব মেলানো ভার। হাওয়ার স্পন্দনে বৃক্ষপত্র যেমন দুলে ওঠে, তেমনি রবীন্দ্রজীবনে বিচিত্র ভাব-অনুভাব পত্রাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আর তেমনি পত্রের সংখ্যা অসংখ্য। রবীন্দ্রনাথের এই পত্রাবলীর মধ্যে তাঁর জীবনের ষড় ঋতু কখনও আনন্দে, কখনও বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যে পত্রসাহিত্যের একটি বিশেষ স্থান আছে। ভলতেয়ার, কীটস, বায়রণ, লরেন্স, ক্যাথারিন, ম্যানসফিল্ড প্রভৃতির পত্রাবলী ইউরোপীয় সাহিত্যের মধু ভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে প্রাক রবীন্দ্রযুগে এক মাইকেল মধুসূদন ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন পত্র কেউ রচনা করেন নি। মধুসূদন তাঁর পত্রাবলীতে তাঁর মনের অনেক ভাব-ব্যঞ্জনাই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তবে সে সব পত্র ইংরেজি ভাষায় রচিত। সে হিসাবে রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সার্থক পত্র লিখিয়ে। তাঁর পত্রসাহিত্যের ভাণ্ডার বহু বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ। আর তার পরিধিও বহু বিস্তৃত।

চিঠিপত্রের একটি গুণ এই যে, তার মধ্য থেকে পত্র লেখকের নিরাবরণ মনের সহজ রূপটিকে উদ্ধার করা যায়। সে যেন অন্দর-মহলের অন্তরতম কথা। তার মধ্যে সাজসজ্জার কোনো চেষ্টা নেই। লেখকের মনের আকাশে যখন সে রঙ লেগেছে, তাঁর লেখা চিঠি-পত্রে তখন সেই রঙটিরই হুবহু প্রতিফলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছিন্নপত্রে'র এক জায়গায় 'আমিয়েলের জার্নাল' সম্পর্কে বলেছেন, 'এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি।

…পত্র সাহিত্য সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা বলা যায়। লেখককে তাঁর জীবন চরিতে খুঁজে পাওয়া না গেলেও, এই পত্রের প্রাঙ্গণ থেকে কিছুতেই তিনি আড়াল হয়ে থাকতে পারবেন না।

রবীন্দ্র-পত্রাবলীকে সোজাসুজি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সাধারণ পত্র, (২) ঐতিহাসিক পত্র, (৩) কবিতায় পত্র ও (৪) পত্রের খামে মোড়া প্রবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে যে সব চিঠিপত্র লিখেছেন সেগুলোকেই আমরা সাধারণ পত্র বলে উল্লেখ করতে চাই। সে হিসাবে তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'ছিন্নপত্র' (১৮৮৫-১৮৯৫), 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৯১৭-১৯২৪), 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯২৬-১৯৩৮) প্রভৃতি সকল পত্রই এই সাধারণ শ্রেণীর পত্র। অর্থাৎ যে সব পত্রের জন্যে রবীন্দ্র-পত্রাবলী সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত, তার প্রায় সবগুলোই এই শ্রেণীতে পড়ে। এই সাধারণ পত্রাবলীকেও আবার দু'টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়— (১) 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ও 'ছিন্নপত্র' এবং (২) 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ও পরবর্তী যুগের পত্রসম্ভার।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'গুলো লেখেন তখন তাঁর বয়স সতেরো-আঠারো বছর। এই সতেরো-আঠারোর দৃষ্টি দিয়ে তিনি সেদিন ইউরোপকে যে ভাবে দেখেছিলেন, তারই কিছু কিছু চিত্র ফুটে উঠেছে এই চিঠিগুলোর মধ্যে। ইউরোপ সম্পর্কে কবির এই অপরিণত বয়সের সব মন্তব্যই যে ঠিক তা নয়। তার মধ্যে অনেক দোষ ত্রুটি আছে। তবে একটি দিক দিয়ে এ পর্যায়ের চিঠিগুলো মূল্যবান। সেটি হলো এসব চিঠিতে ব্যবহৃত কথ্যভাষা। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে কথ্যভাষায় সুন্দর গদ্য রচনা করেছেন, কিন্তু তার প্রথম সূচনা হয়েছিল এই 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'গুলোর মধ্য দিয়ে। এই পত্রগুলো সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, " 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রশ্রেণী' আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়।

এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে, সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারিনে, কিন্তু আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।… …আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এ চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"

'ছিন্নপত্রে'র চিঠিগুলো ১৮৮৫ সাল থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে লেখা। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ তখন তিনি এই পত্রগুলো লিখেছিলেন। এই পর্যায়ের চিঠিগুলো সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, " 'ছিন্নপত্র' পর্যায়ে যে চিঠির টুকরোগুলি ছাপানো হয়েছে তার অধিকাংশই আমার ভাইঝি ইন্দিরাকে লেখা চিঠির থেকে নেওয়া। তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, আমার পথ চলা মনে সেই সকল গ্রামদৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল, তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে। কথা কওয়ার অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, কোথাও কৌতুক কৌতূহলের একটু ধাক্কা পেলেই তাদের মুখ যায় খুলে। যে বকুনি জেগে উঠতে চায় তাকে টেঁকসই পণ্যের প্যাকেটে সাহিত্যের বড়ো হাটে চালান করবার উদ্যোগ করলে স্বাদের বদল হয়। চারিদিকের বিশ্বের সঙ্গে নানা কিছু নিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় আমাদের মোকাবিলা চলছেই, লাউড স্পীকারে চড়িয়ে তাকে ব্রডকাষ্ট করা সয়না। ভিড়ের আড়ালে চেনা লোকের মোকাবিলাতেই তার সহজরূপ রক্ষা হতে পারে।"

'ছিন্নপত্রে'র চিঠিগুলোর মধ্যে কবির গভীর নিসর্গপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমত্তা পদ্মা ও তার কূলে কূলে তালতমালের ছায়া ঘেড়া ছোট ছোট গ্রাম। গ্রামের সহজ সরল মানুষ কবিকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। কবি যেন এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছেন। একখানা চিঠিতে কবি লিখছেন—"আজ সমস্ত দিন নদীর উপরে ভেসে চলেছি। আশ্চর্য এই বোধ হচ্ছে যে,

কতবার এই রাস্তা দিয়ে গেছি, এই বোটে চড়ে জলে জলে বেড়িয়েছি, এবং নদীর দুই তীরের মাঝখান দিয়ে ভেসে যাবার যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে, সে উপভোগ করেছি। কিন্তু দুই দিন ডাঙ্গায় বসে থাকলে সেটা ঠিক আর মনে থাকে না। এই যে একলাটি চুপ করে বসে চেয়ে থাকা, দুই ধারে গ্রাম, ঘাট, শস্যক্ষেত্র, কত বিচিত্র ছবি দেখা দিচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে,····· গভীর রাত্রে যেদিন ঘুম নেই, সেদিন উঠে বসে দেখি, অন্ধকারাচ্ছন্ন দুই কূল নিদ্রিত, মাঝে মাঝে কোন গ্রামের বনে শৃগাল ডাকছে এবং পদ্মার নীরব খরস্রোতে ঝুপঝাপ করে খসে পড়ছে—এই সব পরিবর্তনশীল ছবি যেমন চোখে পড়তে থাকে, অমনি মনের ভিতর একটা কল্পনার স্রোত বইতে থাকে এবং তার দুই পারে তটদৃশ্যের মতো নব নব আকাঙ্ক্ষিত চিত্র দেখা দিতে থাকে।" (৫৬নং পত্র)।

'ছিন্নপত্রে'র অনেক পত্রে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যের কোনো কোনো নিসর্গ কবিতার ছায়া পড়েছে। তা ছাড়া 'গল্পগুচ্ছে'র অনেকগুলো বিখ্যাত গল্পের পটভূমিকাও এই সব পত্রে খুঁজে পাওয়া যায়। 'ছিন্নপত্রে'র পত্রাবলীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার অপূর্ব দীপ্তি ফুটে উঠেছে। কবির শিল্পীমনের পরিচয় এই সব পত্রের ছত্রে ছত্রে বর্তমান।

'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ও 'ছিন্নপত্রে'র পত্রগুলো কবির চৌত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে লেখা। তখনও তিনি বিশ্ববিখ্যাত হননি। এই সব পত্র কোনকালে গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হবে বলেও হয়তো তাঁর ধারণা ছিল না। কাজেই এই সব পত্রে কৃত্রিম সাজসজ্জার কোনো প্রয়াস নেই। কবির মনের সকল কথা এখানে সহজ আকারে প্রকাশিত। আর শ্রেষ্ঠ পত্রের ধর্মই হলো তাই। কাজেই 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' এবং বিশেষ করে 'ছিন্নপত্রে'র পত্র-গুলো রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পত্রসাহিত্যের নিদর্শন। তবে এ কথা ঠিক যে এই সব পত্রের কোনোটিতেই কবি তাঁর বক্তব্যকে তথ্যের মধ্যে

বদ্ধ রাখতে পারেন নি, ভাব যখন উচ্ছল হয়ে উঠেছে তখন তা তথ্যের প্রাকারকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এই ভাবে তথ্যকে উত্তরণ করে যাওয়া আদর্শ পত্র লেখকের পক্ষে দুর্বলতা। কবি পরবর্তীকালে নিজেই তাঁর এই দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন, "আমার চিঠিগুলো চিঠি নয় এই তর্ক উঠেছে। আমি নিজে অনেকবার স্বীকার করেছি যে, আমি চিঠি লিখতে পারিনে।......ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস। সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া অল্প লোকের শক্তিতেই আছে। কথা বলবার বিষয় নেই অথচ কথা বলবার রস আছে এমন ক্ষমতা ক'জন লোকের দেখা যায়।......যদি মনে না করো আমি অহঙ্কার করছি তা হলে সত্য কথা বলি, অল্প বয়সে আমি চিঠি লিখতে পারতুম, যা-তা নিয়ে। মনের সে হাল্‌কা চাল অনেকদিন থেকে চলে গেছে, এখন মনের ভিতর দিকে তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করে চলি। চিন্তা করতে করতে কথা কয়ে যাই—দাঁড় বেয়ে চলিনে, জাল ফেলে ধরি। উপরকার ঢেউয়ের সঙ্গে আমার কলমের গতির সামঞ্জস্য থাকে না। যাই হোক, একে চিঠি বলে না। পৃথিবীতে যারা চিঠি লেখায় যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প। যে দু' চার জনের কথা মনে পড়ে তারা মেয়ে।" (পথে ও পথের প্রান্তে—৮৮-৯০)।

'ভানুসিংহের' পত্রাবলী ১৯১৭ সাল হতে ১৯২৬ সাল অর্থাৎ কবির ছাপান্ন থেকে তেষট্টি বছর বয়সে লেখা। আর 'পথ ও পথের প্রান্তে'র পত্রগুলোর রচনাকাল ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে। কবির বয়স তখন তেষট্টি থেকে ছিয়াত্তর বছর।

'ভানুসিংহের পত্রাবলী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"পত্রধারার দ্বিতীয় পর্যায়ের (ভানুসিংহের পত্রাবলী) চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল একটি বালিকাকে। সে চিঠির বেশির ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্যে দিয়ে স্বতই বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি। এগুলিতে মোটা সংবাদ

কিছু নেই, হাসি তামাশায় মিশে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস ; আর তারি সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ।"

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন এই যে, এই শেষ পর্যায়ের চিঠিগুলো রবীন্দ্রনাথের অনেকটা পরিণত বয়সে লেখা। কবি তখন সুবিখ্যাত। এ সব চিঠি যে কোনো না কোনো দিন প্রকাশিত হবে কবি সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। কাজেই প্রথম পর্যায়ের চিঠিগুলোর ভেতর যেমন একটা 'ভারহীন সহজ রস' ছিল এবং অনেক সময় 'মোটা সংবাদ'ও ছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ের চিঠিগুলোতে তা অনুপস্থিত। এগুলোতে কবি অনেক ঢেকে, অনেক সাজিয়ে কথা বলেছেন। কাজেই পত্রসাহিত্যের যে বিশেষ গুণ কথা বলার জন্যেই কথা বলা, এ সব পত্রে সে মেজাজটি প্রায় নেই। এখানে যে মেজাজটি ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে তাকে বলতে হয় 'চিন্তা করতে করতে কথা বলা'।

'ভানুসিংহের পত্রাবলী' নামকরণের মধ্য দিয়ে কবির একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে হয়। ভানুসিংহ এই ছদ্ম নামটি কবি জীবনে মাত্র দু'বার ব্যবহার করেছেন। একবার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে, দ্বিতীয় বার এই 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে। কবির এই দ্বিতীয়বার ভানুসিংহ নামটির ব্যবহারের উদ্দেশ্য হয়তো এই যে, এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কিশোর বেলার স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। এই ধারার পত্রগুলো একটি চৌদ্দ বছরের কিশোরীকে লেখা। কাজেই মনের দিক দিয়ে কবি 'তার সমবয়সী' হতে চান।

'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে কখনও একটা কৌতুকের বিদ্যুৎ ঝলক উঠেছে, কখনও সেই কৌতুকের পরিমণ্ডল ত্যাগ করে কবি প্রকৃতির রূপে তন্ময় হয়ে গেছেন। একটি কৌতূহলোদ্দীপক পত্রাংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাক—

"আজ তোমার চিঠি পেতে দেরি হল দেখে ভাবলুম হয়তো অমৃতসর কংগ্রেসে তোমাকে ডেলিগেট করেছে কিংবা হাওয়া-জাহাজে কাপ্তেন রসের সঙ্গে তুমি অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েছ। কিংবা হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গে কোন পওহারী বাবার শিষ্য হয়ে মাটির নীচে বসে একমনে নিজের নাকের ডগা নিরীক্ষণ করচ কিংবা লয়েড জর্জের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সর্দি হয়েছে খবর পেয়েই তুমি সেই পদের জন্য দরখাস্ত করতে ইংলণ্ডে চলে গিয়েছ।" এই পত্রাংশের ভেতরে যে একটি সস্নেহ বিমল কৌতুক মুক্তোর দীপ্তির মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে তা পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না।

কবি কখনও কখনও আবার প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে গেছেন। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র এই ধরণের চিঠিগুলো 'ছিন্নপত্রের'ই কোনো কোনো চিঠির সমধর্মী। রবীন্দ্রনাথ এখানে কবির দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যে যেন মুগ্ধ বিমোহিত। দৃষ্টান্ত হিসাবে একখানা চিঠিই এখানে তুলে ধরি—

"দিনগুলো আজকাল শরৎকালের মতো সুন্দর হয়ে উঠেচে। আকাশে ছিন্ন মেঘগুলো উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমলকী গাছের পাতাগুলিকে ঝর্‌ঝরিয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্চে, তার মধ্যে একটা আলস্যের সুর বাজছে, আর বৃষ্টিতে ধোওয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলো থেকে বেজে ওঠা গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। আমার ঠিক চোখের উপরেই সন্তোষবাবুর বাড়ির সামনেকার সবুজ ক্ষেত রৌদ্র ঝলমল করে উঠেচে; আর তারই একপাশ দিয়ে বোলপুর যাবার রাঙা রাস্তাটা চলে গেছে—ঠিক যেন একটি সোনালী সবুজ শাড়ির রাঙা পাড়ের মতো। খুব ছেলেবেলা থেকেই এই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে আমার গলাগলি ভাব—তাই আমার জীবনের কত কালই নদীর নির্জন চরে কাটিয়েছি। তারপরে কতদিন গেছে এখানকার নির্জন প্রান্তরে। তখন এখানে বিদ্যালয় ছিল না,

তখন শান্তিনিকেতনের বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় বসে খুব বৃহৎ একটি নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতুম—রাত্রে ঐ বারান্দায় যখন শুয়ে থাকতুম তখন আকাশের সমস্ত তারা যেন আমার পাড়া-পড়শির মতো তাদের জান্‌লা থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে কী বলতো, তাদের কথা শোনা যেতো না, কিন্তু তাদের মুখের চোখের হাসি আমাকে এসে স্পর্শ করতো। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধা এই যে সে আনন্দ দেয়, কিন্তু কিছু দাবী করে না, সে তার বন্ধুত্বকে ফাঁসের মতো বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করে না, সে মানুষকে মুক্তি দেয়, তাকে দখল করে নিতে চায় না।"

'পথে ও পথের প্রান্তে'র চিঠিগুলো যাঁর কাছে লেখা তিনি প্রাপ্তবয়স্কা ও শিক্ষিতা। কাজেই রবীন্দ্রনাথ এখানে আরও স্বাধীন। তাঁর কাছে লেখা চিঠিতে কবি সব কিছু নিয়েই আলোচনা করতে পারেন, সেখানে কোনো বিষয়ের দ্বার বন্ধ নয়। কিন্তু কবি শুধু চিঠি লেখার জন্যেই যে এই সব চিঠি লিখেছেন তা নয়, অনেক চিঠিতে গ্রাহিকা শুধু উপলক্ষ্য মাত্র, কবির মূল লক্ষ্য হলো কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। এই চিঠিগুলো সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই বলেছেন—"পত্রধারার তৃতীয় পর্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'পথে ও পথের প্রান্তে'। তার একটু ইতিহাস আছে। সেবার যখন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম, সেখানকার নানা দেশে আমার ডাক পড়েছিল।......অবশেষে য়ুরোপ ভ্রমণের পালা শেষ করে যখন আমরা গ্রীসের বন্দর থেকে ঘরমুখো জাহাজে চড়ে বেরিয়ে পড়লুম তাঁরা (শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ ও তাঁর পত্নী) রয়ে গেলেন বিদেশে। তখন তাঁদের সাহচর্যে-গাঁথা পথযাত্রার ছিন্ন সূত্রকে যে-সব চিঠির দ্বারা জুড়তে জুড়তে চলেছিলুম দেশের দিকে, সেইগুলো ও তার পরবর্তীকালের চিঠিগুলো পত্রধারার তৃতীয় পর্যায়ে সঙ্কলিত হলো। কিছুকাল ধরে নতুন নতুন

অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিরন্তর যে তর্ক-বিতর্ক আলোচনা চলেছিল তারই বাক্যালাপের বেগ এই চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।”

বস্তুত এই পর্যায়ের সমস্ত চিঠিতে কবি গ্রাহিকাকে উপলক্ষ্য করে তাঁর নিজের মনের নানা কথা বলেছেন। নানা ‘তর্ক-বিতর্ক’ ও ‘আলোচনা’র বেগ এই শ্রেণীর পত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে, কিংবা কোথাও ঘটেছে কবির উৎফুল্ল মনের প্রকাশ। এখানে এই পর্যায়ের একটি চিঠির একাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

“আজ সকালে বিচ্ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে চমৎকার সূর্যোদয় হয়েছিল, ঈষৎ বাষ্পাবিষ্ট তার সকরুণ আলো এখানকার গাছপালা বাড়িঘর সব কিছুকে স্পর্শ করেছিল। এই তো চিরপূর্ণতার সুর, এই তো বিশ্বকে চিরনবীন করে রেখেছে—যত বড়ো আঘাত, যত নিবিড় কালিমাই জগতের গায়ে আঁচড় কাটতে থাকে তার কোনো চিহ্নই থাকে না, পরিপূর্ণের শান্তি সমস্ত ক্ষয়কে অনিষ্টকে নিয়তই পূরণ করে বিরাজ করে।”

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের চিঠির সংখ্যা নির্দিষ্ট করা এখনও সম্ভব হয়নি। পূর্ববর্ণিত নানা পর্যায়ের চিঠিপত্র ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত চিঠিই আরও বহু আছে। অনেক অপ্রকাশিত পত্র এখনও নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এই সব চিঠিপত্র একদিকে যেমন সৃষ্টিশীল সাহিত্য, অন্যদিকে তা আবার কবির রচনা আলোচনার রসদ। বরীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে, তাঁর সাহিত্যকে যথার্থভাবে বুঝতে হলে এই সব চিঠির সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথ অনেক ঐতিহাসিক পত্রও লিখেছেন। সে সব পত্রের মধ্য দিয়ে তার জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ বারবার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের প্রতিবাদে ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ করে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল-এর কাছে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, রবীন্দ্র-নাথের লেখা ঐতিহাসিক চিঠিগুলোর মধ্যে সেটিই সব চেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। এই চিঠির অক্ষরে অক্ষরে যেন বিক্ষুব্ধ কবি-হৃদয়ের স্বাক্ষর পড়েছে। মূলত চিঠিটি ইংরেজিতে রচিত হলেও কবি নিজেই এর একটি বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। এ ছাড়া হাউস অব কমন্সের সদস্যা মিস র‍্যাথবোন ভারতবর্ষ সম্পর্কে কুৎসা প্রচার করলে কবি রোগশয্যা থেকেও তার যে উত্তর দেন তার মধ্য দিয়ে পরাধীন জাতির মর্মবেদনা উন্মুক্ত অসির ন্যায় ঝলসিত হয়ে ওঠে। 'ছিন্নপত্র', 'ভানু সিংহের পত্রাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন চিঠিতেও বহু ঐতিহাসিক ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। সেগুলোকেও নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক চিঠির মর্যাদা দেওয়া চলে।

রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দে লেখা' চিঠির সংখ্যাও নগণ্য নয়। এই সব চিঠির অনেকগুলো কবিতাকারে রবীন্দ্র রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই ধরনের চিঠির মধ্য দিয়ে কখনও নৈসর্গিক সৌন্দর্য, কখনও চটুল হাস্যপরিহাসের ভাবটি ফুটে উঠেছে। এখানে দু' এক খানি 'ছন্দে লেখা' পত্রাংশ উদ্ধৃত করা হলো—

দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদ্দর চাদর হলেই শীত ভাঙানো সম্ভবে।

* * *

এখানে খুব লাগলো ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়।
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন বনের গন্ধ বয়।

কিংবা—

যদি জোটে দরদি
ছোটোদি বা বড়দি
অথবা মধুরা কেউ
নাতনির ব্যাঙ্ক-এ
উঠিবে আনন্দিয়া
দেহ প্রাণ মন দিয়া
ভাগ্যেরে বন্দিবে
সাধুবাদ থ্যাঙ্ক-এ।

অথবা একটি ছোট মেয়েকে 'ছন্দে লেখা' একটি চিঠি—

সেই কলমে আছে মিশে
ভাদ্রমাসের কাশের হাসি,
সেই কলমে সাঁঝের মেঘে
লুকিয়ে বাজে ভোরের বাঁশি।
নতুন চিকন অশথ পাতা
সেই কলমে আপনি নাচে
সেই কলমে মোর বয়সে
তোমার বয়স বাঁধা আছে।

ইন্দিরা দেবী, নন্দিনী দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী প্রভৃতির কাছে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দে-লেখা' এইরূপ বহু চিঠির নিদর্শন উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ভ্রমণকাহিনীই পত্রাকারে লেখা। কিন্তু সেগুলোকে ঠিক ঠিক পত্রসাহিত্য পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। পত্রসাহিত্যের 'সহজ রসের ভার' সেগুলোতে নেই, তাতে গুরু রসের গুরু ভার। পত্রের খামে মোড়া প্রবন্ধ বললেই তাদের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। আসলে ওগুলো ভ্রমণ সাহিত্য, পত্রের ঢঙটা ওর একটা 'ফর্ম' বা স্টাইল মাত্র। এ পর্যায়ের রচনায় 'জাপান যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানদৃষ্টি

বিজ্ঞান ও সাহিত্য এ দু'টির স্বভাব আলাদা। বিজ্ঞান বস্তুবাদী, সাহিত্য বাস্তববিমুখ না হলেও রসজ্ঞ। বিজ্ঞানের কাজ বস্তুকে তার অবিকৃত-রূপে যথাযথরূপে প্রত্যক্ষ করা। সাহিত্য কিন্তু তাতেই খুশি নয়। সাহিত্যে বস্তুর বাস্তবিকতা চলতে পারে, কিন্তু সে বস্তুর রূপে রসে সুন্দর এবং সরস হওয়া চাই। বিজ্ঞান শুধু বস্তুকেই চায়, সাহিত্য তার প্রতিভাসকেও। বিজ্ঞানের দৃষ্টি বস্তুর যাথার্থ্যের দিকে, সাহিত্য কেবলমাত্র ওটুকু পেয়েই তুষ্ট হতে পারে না। সে বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্য আরোপ করে তাকে সুন্দর করে দেখতে চায়, পেতে চায়।

দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে বিজ্ঞানে আর সাহিত্যে এই মৌল পার্থক্য। বিজ্ঞান নির্বিকার, সাহিত্য অনুভূতিপ্রবণ। আর মানুষ ও মানুষের অনুভূতি নিয়েই সাহিত্যের কারবার। কাজেই যে মানুষ বিজ্ঞানের পরখশালায় না হলেও বিজ্ঞান প্রভাবিত যুগে লালিত তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে বিজ্ঞানের সত্য উপস্থিত থাকা স্বাভাবিক। তবে সে সত্যটি সেখানে সৌন্দর্যের মুকুট পরে কল্পনার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। সেটা হলো বিজ্ঞানের সত্য আর সাহিত্য-সত্যের হরগৌরী-রূপ। অন্যদিক দিয়ে বিজ্ঞানীর মনটি সাহিত্যের রসে রসাল হলেও নির্বিকার বিজ্ঞানের উপর তার কোনো প্রভাব নেই। কেন না বিজ্ঞানের সত্য বস্তুরূপকেই দেখে। সে তার আতিশয্যকে সহ্য করে না।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। তাঁর দৃষ্টি জীবনমুখী হলেও জীবনে যা ঘটে তার সবটুকু তাঁর কাছে সত্য নয়। জীবনের যে সত্য তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে নাড়া দেয় কবির কাছে সেটুকুই সাহিত্যের সত্য। তবুও কবি সামাজিক জীব। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই

কবিমানসে সামাজিক চেতনার প্রতিফলন ঘটে। রবীন্দ্রমানস যে সমাজে লালিত-বর্ধিত, সে সমাজ বিজ্ঞানকে উন্নতির সোপান হিসাবে গ্রহণ করেছে। ইউরোপের যন্ত্রযুগের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে। কাজেই রবীন্দ্র-মানসও যে সে ফসলে সমৃদ্ধ হয়েছে সেটাই স্বাভাবিক। বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছেন। বাল্যে যে দু'টি ব্যক্তি এই বিজ্ঞানের জ্ঞানকে তাঁর কাছে উপস্থিত করেছিলেন তাঁরা হলেন তাঁর গৃহ-শিক্ষক শ্রীসীতানাথ দত্ত ও কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। এ সম্পর্কে কবি 'বিশ্বপরিচয়ে'র ভূমিকায় লিখেছেন— "বাল্যকাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন নয়-দশ বছর। মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ দত্ত মহাশয়।...বিজ্ঞানের অতি সাধারণ দুই একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন আমার মন বিস্ফারিত হয়ে যেত।...তারপর বয়স আরো বেড়ে উঠল। ইংরেজি ভাষা অনেকখানি আন্দাজে বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার খুলেছে। সহজবোধ্য বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়ি নি। মাঝে মাঝে গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে, তার কৃচ্ছ্র তার উপর দিয়ে মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি।......জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বিষয়ের বই তখন কম বের হয়নি। স্যার রবার্ট বল-এর বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্বস্, ফ্লামারিয়ঁ প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি—গলাধঃকরণ করেছি শাঁসসুদ্ধ বীজসুদ্ধ। তারপর এক সময় সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হাক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালা।"

সীতানাথ দত্ত সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি আরও লিখেছেন, "ইহা ছাড়া তিনি প্রকটরের লিখিত সরল পাঠ্য ইংরেজি জ্যোতির

গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতেন, আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।" পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন, "ডাক বাংলায় পৌঁছিলে পিতৃদেব বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আরও স্বচ্ছ হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহ তারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন!" আরো বলেছেন, "শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্ব মাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।" 'বিশ্ব-পরিচয়ে'র ভূমিকাংশে রবীন্দ্রনাথ এসব তথ্য নিজেই পরিবেশন করেছেন।

উপরে পরিবেশিত তথ্য থেকে বোঝা যায়, বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রমানস বিজ্ঞান রসে সমৃদ্ধ ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯২২ সালে প্রকাশিত 'Creative Unity' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, '....modern Science is Europe's great gift to humanity for all times to come. We, in India, must claim it from her hands, and gratefully accept it in order to be saved from the curse of futility by lagging behind. We shall fail to reap the harvest of the present age if we delay." বিজ্ঞানচর্চার সুফল সম্পর্কে তিনি তাঁর 'প্রসঙ্গ কথা' প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। "বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষাশক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তাক্রিয়ার যথার্থতা জন্মে এবং সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধ সংস্কার সূর্যোদয়ে কুয়াসার মতো দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়।" বিজ্ঞানের প্রতি এই আকর্ষণই

পরবর্তীকালে কবিকে 'বিশ্বপরিচয়' নামে আলোচনাগ্রন্থ লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করলে সাহিত্যের দিকটায় ভাটা পড়বে রবীন্দ্রনাথ সেকথা বিশ্বাস করতেন না। তিনি 'বিশ্বপরিচয়ে' বলেছেন—"বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে।" কবির সপ্ততিতম জন্মদিনে তাঁর বন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু লিখেছিলেন—"জীবনের বহু বিচিত্র বিকাশ ও ধারার পরিচয় লাভের পথে একদা আমি তিলে তিলে অগ্রসর হইতেছিলাম। সেই ক্লান্তিহীন প্রয়াসে বৎসরের পর বৎসর তিনি আমাকে প্রতিদিন সখ্য ও সাহচর্য দান করিয়াছেন। সহস্র সহস্র বৎসরের মৌনতা বাণীহীন তরুলতা অবশেষে একদিন যেন কথা কহিয়া উঠিল, আপন অন্তরজীবন সুখ-দুঃখ পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী সে আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া চলিল। এই স্বরচিত ইতিহাসের দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইল যে, উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত নিখিল জীবলোকে একই প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইতেছে, একই প্রাণধারা সর্বত্রই বহমান। যে বাধা একদিন আত্মীয় হইতে অনাত্মীয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা দূর হইল। উদ্ভিদ ও প্রাণী একই জীবনধারায় বহুমুখী বিকাশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই মহাসত্যকে জানিতে পারিলে জগদ্ব্যাপারে পরম রহস্যের যবনিকা ঘুচিয়া যাইবে না, বরং গভীরতর নিবিড়তর হইয়া উঠিবে। মানুষ যে তাহার অসমাপ্ত জ্ঞান, অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ও অক্ষম শক্তি লইয়াও অবিনির্ণীত দিক্ মহাসমুদ্রে দুঃসাহসিক জয়যাত্রায় আপনার চিত্ততরণী ভাসাইয়া দিল একি কম আশ্চর্যের কথা? যে অবর্ণনীয় রহস্য তাহার দৃষ্টির অগোচর ছিল, এই অভিযানপথে অকস্মাৎ একদিন সে রহস্য মুহূর্তকালের জন্য তাহার গোচরীভূত হইতে থাকে এবং যে আত্মসর্বস্বতা এতকাল তাহাকে বিশ্বব্যাপী প্রাণ-স্পন্দনের প্রতি বিমুখ চিত্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা তাহার মন

হইতে মুহূর্তকালের মধ্যে নিঃশেষে মিলাইয়া যায়। বিশ্বজগতের এই ঐক্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির নিকটে ধরা দিয়াছে এবং তাঁহার কাব্যে ও সাধনায় এই ঐক্যধারাই আত্মপ্রকাশ করিতেছে।"

এই পথেই বিজ্ঞানের সত্য রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে সাহিত্যের মধ্যে রূপলাভ করেছে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে সেই আলোচনায় রবীন্দ্রমানসের বৈজ্ঞানিক মেজাজটি কিভাবে তাঁর রস-সাহিত্যেও ঠাঁই করে নিয়েছে প্রথমেই তারই সন্ধান করা দরকার।

প্রথমে কাব্যসাহিত্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। আগেই বলেছি বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রমানস বিজ্ঞানের রসধারায় লালিত। তখন থেকেই তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকেফহাল। কবির এই বিজ্ঞানভাবনা 'প্রভাত সঙ্গীতে'র যুগে লেখা 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতাটির মধ্য দিয়েও আত্মপ্রকাশ করেছে। এ থেকে কবির জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর দখলের সংবাদ পাওয়া যায়। ঐ কবিতায় তিনি লিখছেন—

দেশ শূন্য, কালশূন্য, জ্যোতিশূন্য মহাশূন্য পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,
* * *
লেগেছে ভাবের ঘোর, মহানন্দে পূর্ণতার প্রাণ
নিজের হৃদয় পানে চাহি,
সহসা আনন্দ সিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া
আদিদেব খুলিল নয়ান,

তারপর,

জগতের গঙ্গোত্রী শিখর হতে
শতশত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময়ী বাণী ;
উচ্ছ্বসিল বাষ্পময় ভাব।

উত্তরে দক্ষিণে গেল,
পূরব পশ্চিমে গেল,
চারিদিকে ছুটিল তাহারা,
আকাশের মহাক্ষেত্রে সেসব উচ্ছ্বাস বেগে
নাচিতে লাগিল মহোল্লাসে।

*   *   *

অবশেষে আকাশ ব্যাপিয়া
পড়িল প্রেমের আকর্ষণ।
এ ধায় উহার পানে
এ চায় উহার মুখে
আগ্রহে ছুটিয়া কাছে আসে।
বাষ্পে বাষ্পে করে আলিঙ্গন।
অগ্নিময় কাতর হৃদয়
অগ্নিময় হৃদয়ে মিশিছে।
জ্বলিছে দ্বিগুণ অগ্নিরাশি
আঁধার হইতে চুর চুর।
অগ্নিময় মিলন হইতে
জন্মিতেছে আগ্নেয় সন্তান
অন্ধকার শূন্য মরু-মাঝে
শত শত অগ্নি পরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।

কাণ্ট, নিউটন, জীনস প্রমুখ বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে সংক্ষুব্ধ অসম সঞ্চারী জড়বাষ্পের মিলনের ফলেই বিশ্বজগতে গ্রহ-তারকার উদ্ভব ঘটেছে, কবির 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতাটি সেই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসেরই প্রকাশ। রসের ফোড়নে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও রীতিমতো সরস হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি সম্পর্কে কবি তাঁর বাল্য বয়সের

একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "পার্মীয় স্তর আঙ্গার্য স্তর সহ জীব এবং উদ্ভিজ্জ সৃষ্টিতে এত সাদৃশ্যযুক্ত যে, পার্মীয় স্তর আঙ্গার্য স্তরের বিস্তৃতি বলিলেই হয়। এইখানে মৎস্যযুগের সন্ধ্যা, পৃথিবী এখানে 'কনে বউ' অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিরাগমনের উদ্যোগ করিতেছেন। মৎস্যযুগের আলোচনায় দেখা গেল যে, পৃথিবীর নানারূপ অবস্থা পরিবর্তন এবং কাল পরিবর্তন সত্ত্বেও, একবার জীবসঞ্চার হইয়া আর কখনই তাহার নিবৃত্তি হয় নাই, এবং যত আপদ-বিপদই ঘটুক, সেই জীবসৃষ্টি ক্রমে পৃথিবীর উন্নতিসহ উন্নতি ভিন্ন অবনতি প্রাপ্ত হয় নাই।" এরপর জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি আরও গ্রন্থ পাঠ করেছেন। বিশেষ করে ডারউইনের জীবতত্ত্ব তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। 'সোনারতরী'র যুগে এই প্রভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটিতে। সমুদ্রকে সম্বোধন করে কবি বললেন—

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে
শুনিতেছি ধ্বনি তব।...
মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃ হৃদয়ের অতিক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনে যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

তারপর 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি পৃথিবীর সঙ্গে নিজের আত্মিক যোগ উপলব্ধি করলেন। সে যোগ গভীর। নিবিড়। তিনি বললেন—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনী দিন
যুগ-যুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।···
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লব নিলয়ে
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান রবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন।

'বলাকা' যুগে কবি আবার পদার্থ বিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্তগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়। পদার্থের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জে. এ. টমসন কর্তৃক সম্পাদিত "The Outlines of Science' গ্রন্থে বলা হয়েছে—"There is no such thing as rest. Every particle that goes to make up our solid earth is a state of perpetual unremitting vibration." পদার্থের এই গতিধর্মই 'বলাকা' কাব্যের মূল সুর। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোন খানে'—গোটা 'বলাকা' কাব্যে এই অশ্রান্ত গতির ছন্দ। 'বলাকা'র 'চঞ্চলা' কবিতাটিতে এই গতিধর্মের প্রকাশ সুস্পষ্ট।

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল

অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে ;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে ;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্‌বুদের মতো ॥
যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তি ভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূল তনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।

এই ভাবে দৃষ্টান্ত টেনে টেনে দেখানো যায় যে, রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহের মধ্যে বিজ্ঞানের অন্যান্য কয়েকটি বিভাগের সিদ্ধান্তগুলোও অনুপ্রবেশ করেছে। বিজ্ঞানের তত্ত্বে রসের স্পর্শ লেগেছে।

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলোকে এই ভাবে কাব্যে রূপায়িত করার নিদর্শন বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশি নেই।

রবীন্দ্রনাথের এই বৈজ্ঞানিক মেজাজটি তাঁর গদ্য সাহিত্যেও সুপ্রকাশ। 'বিশ্বপরিচয়ে'র কথা এখানে তোলার প্রয়োজন নেই। কারণ 'বিশ্বপরিচয়' মূলত বিজ্ঞান-বিষয়ক একটা আলোচনা গ্রন্থ। বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বকে সহজবোধ্য করে সহজ ভাষায় উপস্থিত করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি সেই তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। 'বিশ্বপরিচয়ে'র রবীন্দ্রনাথ সেই সব তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে না দেখতে পারেন, কিন্তু ওসব বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল খুবই স্পষ্ট। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণ-বিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না। অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।"

রবীন্দ্রনাথের এই মেজাজ তাঁর গল্প-উপন্যাসেও সুপরিস্ফুট। রবীন্দ্র-রচনাবলীর পৃষ্ঠা খুললে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত মিলবে। এখানে আমরা 'শেষের কবিতা'র কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছি।

'শেষের কবিতা'য় যোগমায়া অমিতকে বলছেন, 'বাবা, বিবাহ-যোগ্য বয়সের সুর এখনও তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস্তটা বাল্যবিবাহ হয়ে না দাঁড়ায়।'

উত্তরে অমিত বলেছে, 'মাসীমা আমার মনের স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে, তারই গুণে আমার হৃদয়ে ভারী কথাগুলো মুখে খুব হালকা হয়ে ভেসে ওঠে, তাই বলে তার ওজন কমে না।'

অন্যত্র, অমিত বলছে, 'অক্সিজেন একভাবে বয় হাওয়ার অদৃশ্য থেকে, সে না হোলে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্সিজেন আর

একভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার, দুটোর কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলে না।'

অথবা, কেতকী মিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে অমিত বললো, 'কেটিমিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কায়দা-কারখানার বকযন্ত্র পরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই করা,—বিলিতি কৌলিন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স।'

আর একটি জায়গায়—'এতদিন পরে অমিত একটা কথা আবিষ্কার করেছে যে লাবণ্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা শিলঙশুদ্ধ বাঙালি জানে। গভর্মেণ্ট অফিসের কেরানীদের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাদের জীবিকাভাগ্যগগণে কোন্ গ্রহ রাজা হৈল কে-বা মন্ত্রীবর। এমন সময় তাদের চোখে পড়ল মানব-জীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে এক যুগ্ম-তারার আবর্তন, একেবারে ফার্স্ট ম্যাগনিচুডের আলো। পর্যবেক্ষকদের প্রকৃতি অনুসারে এই দুটি নবদীপ্তমান জ্যোতিষ্কের আগ্নেয় নাট্যের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা চলছে।'

এইসব কথা অন্যভাবেও বলা যেত। বলা যেত আরো সহজ-সোজা করে। রবীন্দ্রনাথ সে পন্থা অনুসরণ করেন নি। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার আচার-আচরণ ভাবনা-রুচি প্রভৃতি বোঝাতে গিয়ে বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে তিনি তাঁর উপমা সংগ্রহ করেছেন। ফলে সেখানে সাহিত্যের রস আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের হর-গৌরী মিলন হয়েছে।

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটিকে রবীন্দ্র-নাথ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকে এই বিরূপতার ভাবটি লক্ষ্য করা যায়। এখানেই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানবিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এর

উত্তরে শুধু এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রমাত্রকেই অকল্যাণকর মনে করেন নি, অকল্যাণকর বলেছেন যন্ত্রের আতিশয্যকে। যে যান্ত্রিকতা মানুষের অন্তরমহলকে দেউলে করে তুলছে তাঁর অভিযোগ শুধু সেই যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। তিনি বলেছেন - "যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড় করে তুলে পশ্চিম সমাজে মানব সম্বন্ধের বিশিষ্টতা ঘটেছে। কেননা, স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান করে তুললে অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীর ভাবে মিলে যায় সেই সৃষ্টি শক্তি শিথিল হতে থাকে।"

কাজেই যন্ত্রের আতিশয্যের বিরোধিতা করা আর বিজ্ঞানের বিরোধিতা করা এক কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি

"My pictures are my Versification
in lines"—Rabindranath.

রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন প্রধানত শিশুমনের খেয়ালের বশে। তাঁর কাব্য পরিণত মনের; তাঁর গভীরতা অতলস্পর্শী। জীবনের যে রহস্য-সূত্র তিনি সমস্ত জীবনের সাধনায় আবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে কোনখানে বাহুল্য নেই, চপলতা নেই। তাই সত্তর বছরে যখন এই জ্ঞান-প্রধান মানুষটির দেহে এলো অবসাদ, তখন সুবিধে পেয়ে মনের গুপ্ত শিশু জেগে উঠলো। সে আপন খুশিমতো কাগজের উপর যা খুশি তাই এঁকে চললো, কবি বাধা দিলেন না। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে এই unsophisticated শিশুমনের আলেখ্য পড়েছে।

এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ছবি আর কাব্য পরস্পর-বিরোধী। মনের ছবি রবীন্দ্রনাথ কাব্যে রূপ দিয়েছেন। কোনো ল্যাণ্ডসকেপ কিম্বা নদীর বর্ণনা করবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তার রূপটি মনে মনে স্পষ্ট কল্পনা করে নিয়েছেন, তারপর তাকে ভাষায় করেছেন তর্জমা। তাঁর এমন অনেক কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে যাকে বলা চলে 'শব্দচিত্র'—অর্থাৎ শব্দের পর শব্দ গেঁথে রবীন্দ্রনাথ একটা সুস্পষ্ট রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাঁর ছবি আঁকার প্রণালী বিপরীত। রেখার পর রেখা আঁকছেন, রঙের পর রঙ, কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই, পরিকল্পনাতো নেই-ই। তারপর দেখা গেল, সেই রেখা আর বর্ণবিন্যাসে একটি ছবি রূপ গ্রহণ করেছে—ছন্দোময় অব্যক্ত একটা বাণীর মতো। তাতে প্রাণ আছে, আছে স্পন্দন, কিন্তু তাকে পরিচিত বা অপরিচিত, বাহ্য জগতের কোনো বস্তুর প্রতিরূপ বলে গ্রহণ করতে বাধে।

কিন্তু পরিচিত বা অপরিচিত কোনো কিছুর সঙ্গে মিল নেই বলেই কোনো ছবি বাতিল হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। ছবির শিল্পমূল্য নির্ধারিত হবে তার তৃপ্তি দানের ক্ষমতা দিয়ে—নকলনবিশির সাফল্য দিয়ে নয়। কাব্যে, সাহিত্যে, সংগীতে কোথাও কবির মন বাঁধাধরা নিয়মের গোলামিতে সায় দেয় নি, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁর সেই মুক্ত-চেতনা দ্বারাই তিনি প্রতিটি চিত্রাঙ্কণে প্রভাবিত হয়েছেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে আত্ম-প্রকাশের নতুন পথ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তুলির আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং এখানেও তিনি নতুন রীতির প্রবর্তন করে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। বার্ধক্যের শ্রান্তিকে অস্বীকার করে পুরাতন-অনুকরণের স্পৃহাকে কাছে ঘেঁষতে না দিয়ে কবি যে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে অননুকরণীয় পদ্ধতিতে দু'হাজারেরও বেশি ছবি এঁকে গিয়েছেন সে কি বড়ো কম কথা। তা ছাড়া কোনো কিছুর সঙ্গে যথার্থ সাদৃশ্য না থাকলেও তাঁর আঁকা প্রতিটি প্রতিকৃতি, প্রকৃতি-চিত্র এবং জীবজন্তুর ছবিই তাঁর মনের নানা অনুভূতির রঙে রঙীন ও রেখায় রেখায় দুর্লভ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয়বাহী। এমন ছবি আনন্দদায়ক না হয়ে পারে কখনো? মনে রাখা দরকার, কর্মটাই আর্ট নয়, বড়জোর তাকে আর্টের একটা লক্ষণ বলা যেতে পারে। কিন্তু সেই লক্ষণের অর্থাৎ সেই কর্মের বেড়াজালে শিল্পীর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য যদি প্রকাশের কোনো সুযোগ না পায় তাহলে সমগ্র শিল্প-প্রয়াসই সেখানে ব্যর্থ। আসলে শ্রেষ্ঠ শিল্পমাত্রই শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের খেয়ালের খেলা এবং সেই সব খেয়ালের নিদর্শনের মধ্যেই সেই সব শিল্পীর ব্যক্তিত্ব যথার্থভাবে প্রকাশিত। সেরা শিল্পী বিশ্বস্রষ্টার বেলাতেও একথা যেমন সত্য, রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও তাই। শাসকের অনুশাসনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যেমন আজন্ম বিতৃষ্ণা, রীতির অনুশাসন সম্পর্কেও ছিল তাঁর ঠিক তেমনি বিরাগ। কাজেই জীবনের চলার পথে পদে পদেই সাধারণের সঙ্গে তাঁর গড়মিলগুলো

যে সুস্পষ্ট হয়ে চোখে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি! এবং এখানেই তো তাঁর আভিজাত্যের, তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়।

বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই ছেলেবেলাকার রবীন্দ্রনাথকে, যিনি ইস্কুলে পালানোর দলে ছিলেন, পড়াশুনার নিয়মকানুনকে দিতেন ফাঁকি, মানতেন না কোনো শাসকের অনুশাসন। তাঁর ছবিও তাঁর মতোই অভিজাত; এই ডেমোক্রেসির যুগেও আর দশটা পড়ুয়ার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তে অরাজী।

ছবি আঁকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি কারুর কাছে কখনো পাঠ নেননি। একজন বিশিষ্ট শিল্পীর সঙ্গে ছবি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার তো আর আর্ট স্কুলে পড়া বিদ্যে নেই, ছবি হয় ত সম্পূর্ণ ই হয় না।" তাহলেও ছবি আঁকার রীতি যে তাঁর একেবারে অজানা ছিল, তাও নয়। আরো দশটা শিল্পকলার মতো ভারতীয় চিত্র-শিল্পের নবযুগের প্রবর্তনাও ঠাকুরবাড়ি থেকেই হয়েছে, এ কাহিনী সকলেই জানেন। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে রবীন্দ্রনাথ বরাবর ছবি আঁকতে দেখে এসেছেন, কাজেই ফলিত-কলার এ প্রদেশটিতে তিনি সম্পূর্ণ আগন্তুক নন। কিন্তু তবু তিনি যখন ছবি আঁকতে শুরু করলেনই তখন মহাজন প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করলেন না। সন্ধানীর মতো নতুন পথের সন্ধান করতে লেগে গেলেন, পাথর কেটে, গাছপালা সরিয়ে, দুস্তর সাগর পার হয়ে। অনভিজ্ঞতার ছাপ যে তাঁর ছবি থেকে খুঁজে বার করা না যায় তা নয়, তবে কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তির জোরে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সেই অনভিজ্ঞতার ছাপ চাপা পড়েছে। 'রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে বলিষ্ঠ কল্পনার পাহারায় অনভিজ্ঞতা কাছে ঘেঁষতে পারে নি।'

রবীন্দ্রনাথের প্রথম আঁকা যে সব ছবি, তা এই। বাংলা আর

ইংরাজিতে তিনি স্বহস্তে কবিতা বা গান লিখেছেন। হয়ত পছন্দ না হওয়ায় পরে সেগুলো খুশিমতো কেটে গেছেন। সেই কাটাকুটিও আবার তাঁর বাণীর মতোই ছন্দোময়,—হয়ত তা ভাসমান মেঘের রূপ নিয়েছে, কখনো বা পাখির। এই পদ্ধতি, যাকে বলা যেতে পারে 'Erasure', রবীন্দ্র-চিত্র-কলা-রামায়ণের ক্রৌঞ্চমিথুন পর্বে এরই লীলা। অবশ্য সুন্দর হস্তাক্ষর বা Calligraphyতে পারদর্শী বলেই তাঁর এই ধরণের ছবি এতটা সফল হয়েছে।

অতঃপর কালো কালির 'মনোপলি' দূর হলো; লাল কালি, সবুজ কালিও এলো। আর কবি তাদেরকে খুশিমতো কাগজে ঢেলে দিতে লাগলেন। রঙ আর শাদা মিশে প্রাণময় হয়ে উঠলো, কখনো একটি বিবর্ণ মানুষের মুখের আভাস, কখনো বা নাম-না-জানা কোনো পশু। কোনো পরিপাট্য বা চেষ্টাকৃত সাবধানতার চিহ্ন নেই। "Stark and agonised features emerge from chaos. When they gain definition, they attain beauty, a threatened balance near to chaos." রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর আঁকা কোনো ছবির যে নামকরণ করেন নি, সেও বোধহয় এই কারণে। একান্তই যা ব্যক্তিগত তার আবার বিষয় নির্দেশের কি প্রয়োজন ?

পরবর্তী কালে কবি কলমের পরিবর্তে তুলি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁর টেকনিক বা পদ্ধতি বদলায়নি, কিম্বা কোনো বিশেষ টেকনিকই গড়ে ওঠেনি। অসীম রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথ তুলির সাহায্যে অপরূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কাব্য যদি হয় 'সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা' তবে তাঁর ছবি সম্পর্কে বলা চলে, তা অসীমের মধ্যে সীমাকে মিলিয়ে দেবার পালা।

রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে আর একটি লক্ষ্য করবার জিনিষ হলো 'evolution of forms' বা রূপের বিবর্তন। কবি রেখার

পর রেখা আঁকছেন, হয়ত ধীরে ধীরে তা কোনো পার্থিব বস্তুর রূপ নিলো। হয়ত পটের উপর ভেসে উঠলো কবির পরিচিত একখানা মুখ। কখনো বা খেয়ালীর মতো এই রূপও হয় বহুরূপী। একটা পাপড়ি পরিণত হলো পাখায়, পদাঙ্ক নিলো নখরের রূপ, অথবা একটা ফুল থেকে জন্ম নিলো পাখি। রবীন্দ্র-চিত্রশিল্পের একটি বড়ো দিক হলো তার রুচিশীলতা। দৃষ্টি যাঁদের স্বচ্ছ ও সুরুচিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথের ছবি তাঁদের ভালো লাগবেই। এ বিষয়ে মস্কো শহরে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী সম্বন্ধে কবি নিজে যা লিখেছেন তা উল্লেখযোগ্য। "মস্কো শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ ছবিগুলো সৃষ্টিছাড়া সে কথা বলা বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে যে তারা কোনো দেশীই নয়। কিন্তু লোকের কি ঠেলাঠেলি ভিড়। অল্প কয়দিনে পাঁচ হাজার লোক ছবি দেখেছে। আর যে যা বলুক, অন্তত আমি তো এদের রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারব না।"

নন্দলাল বসু একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ যে রীতির গোড়াপত্তন করেছিলেন, পরবর্তী কালে অক্ষম শিল্পীদের দুর্বলতায় আর অনুকরণে তার ধারা এসেছিল শুকিয়ে। 'ওরিয়েন্টাল' রীতি বলতে বিশেষ একটি টেকনিকের দাসত্বই বোঝাত। রবীন্দ্রনাথ তাকে মুক্তি দিলেন, দেখালেন, টেকনিকের দাসত্ব না করেও কী করে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

বাংলার আর একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের আঁকা মানুষ যখন দেখি তখন মনে হয় না সেটা এখনি নেতিয়ে পড়বে। স্পষ্ট দেখি মানুষটার ওজন আছে, সতেজ শিরদাঁড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে শক্তিশালী তা' এই হাড়ের জোরেই, ছন্দ গঠনেই। আমার মতে গত দু'শ বছর ধরে রাজপুত আমল থেকে আজ পর্যন্ত, আমাদের দেশের ছবিতে যে

অভাব বেড়ে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে চান ; ছবির জন্যে খোঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া।”

রবীন্দ্রনাথের চিত্রে বিষয়বস্তুর স্থান গৌণ, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জনসাধারণ যদি তাঁর ছবি না বুঝতে পারে বা ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে, তার কারণ এই যে, আজও আমরা শিল্পের প্রাণ রয়েছে কোন কোঠায় তার সন্ধান পাইনি, মনে করি বিষয়বস্তু বা আইডিয়াই প্রধান।

নিজের আঁকা ছবি সম্বন্ধে এবং আমাদের দেশের চিত্র-সমালোচকদের সম্পর্কে কিছু সুস্পষ্ট মন্তব্য রয়েছে শিল্পী শ্রীযামিনী রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে। কবি তাতে লিখেছেন—“…আমার ছবি সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র নিঃসংশয় নই, আজ সুদীর্ঘকাল ভাষার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমার অধিকার জন্মেছে এ আমার মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কোনো দ্বিধা করিনে। কিন্তু আমার ছবির তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাঁকি দিচ্ছে কিনা আমি নিজে তা জানিনে। যখন প্যারিসের আর্টিস্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোন্‌খানে আমার কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বোধকরি শেষ পর্যন্তই তুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার মনের দ্বিধা দূর হবে না। আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাঁদের দোষ দেইনে। আমি জানি চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্রসৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারেন না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার

সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম, এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না।”

রবীন্দ্রনাথের ছবি আসলে হয়ত খেয়ালের খেলা নয়। সুদীর্ঘ বার বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ একনিষ্ঠভাবে কেবল এই শিল্পটিরই সাধনা করেছেন। সাহিত্য-সাধনায় চরম সফলতা তো পেয়েছেন, কিন্তু নিজেকে জানবার ও জানাবার বিষয় শেষ হয়নি। সক্রেটিস-এর বাণী 'know thyself' তাঁর মনে তখনো কাজ করছে। তাই কবিও নতুন রীতির আশ্রয়ী হলেন। একটার পর একটা ছবি এঁকেছেন, কোনোটা শেষ না হতে তাঁর শান্তি নেই। বহু ছবিই তিনি শেষ করেছেন মাত্র এক একটা 'সিটিং'এ। বিস্ময়কর রেখা-বিন্যাসে অপরূপ ছবি ফুটে উঠেছে। হয়ত এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এমনও হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের মনে একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী বরাবরই ছিল ; কিন্তু বহুকাল দর্শন আর সাহিত্য, জ্ঞান আর কর্মের চোখ রাঙানিতে সে বা'র হতে পারে নি। কিন্তু শয়তানকেও তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে হয়। একদিন সেই শিল্পী এলো বেরিয়ে, আপনার প্রাপ্য সে কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে নিলে।

তাঁর কবিতার মতো তাঁর ছবিতে কোনো ক্রম-পরিণতির ধারা নেই। এ সহসা এসেছে আপন খেয়ালে, ভূমিষ্ঠ হয়েই পরিণত। তাঁর কথাতেই তাঁর ছবির পরিচয় মিলবে—

টুক্‌রো যত রূপের রেখা
সঞ্চিত রয় মনের চিত্রশালে,
কখন ছবির আকার নিয়ে
জোড়া লাগায় শিল্পকলার জালে।

রবীন্দ্রনাথের সাংবাদিকতা

"রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র সাহিত্যস্রষ্টা, কবি, ঔপন্যাসিক হইতেন তবে বাঙালীর জাতীয় জীবন গঠনের ইতিহাসে তাঁহার স্থান থাকিত না, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর পাঁচজন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকদের সহিত তাঁহার নাম পাওয়া যাইত। দেশের মঙ্গলা-মঙ্গল তাঁহার জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল বলিয়া তিনি সাহিত্যিক তুরীয়তার মধ্যে অচল হইয়া থাকিতে পারেন নাই, প্রিয় অপ্রিয় কথা অযাচিতভাবে বলিয়াছেন।"—এ মন্তব্য করেছেন কবি-জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং এ বিষয়ে সবাই যে তাঁর সঙ্গে একমত হবেন তাতে সংশয়ের কোনো কারণই থাকতে পারে না। তবে এখানে রবীন্দ্রনাথের যে লক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা মূলত সাংবাদিকের এবং তা নিয়েই হলো কথা।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কর্মী রবীন্দ্রনাথ, ঋষি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি শুনে শুনে আমাদের কান এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, রবীন্দ্রনাথের নামের পূর্বে সাংবাদিক বিশেষণটা শুনলে ঈষৎ খটকা লাগে বৈকি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে কথা বারংবার উল্লেখ করেছি, এ প্রসঙ্গেও তা স্মরণযোগ্য। তাঁর কর্মকাণ্ড শুধু বহুবিধ নয়, তা ছিল প্রায় সর্বব্যাপী। রবীন্দ্রনাথ যদি কর্মী, ঋষি, এমন কি কবিও না হতেন, তথাপি কেবলমাত্র সাংবাদিক হিসাবেই জাতির স্মৃতিপটে বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

রবীন্দ্রনাথ সাংবাদিক একথা বলতে কেউ যেন না বোঝেন, তিনি কোনো দৈনিক পত্রিকায় রাত জেগে বহুকাল প্রুফ রিডারি করেছেন। সে কাজ যে রবীন্দ্রনাথকে করতে হয়নি, বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁকে বহু পত্রের সংস্পর্শে আসতে

হয়েছে, কোনোটার তিনি স্বয়ং সম্পাদক ছিলেন, কোনোটার বা নামে সম্পাদক না হলেও কার্যত সম্পাদকীয় দায়িত্বের অনেক গুরুভারই তাঁকে বহন করতে হতো। তা ছাড়া আরও কত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের সঙ্গে যে তাঁর অপ্রত্যক্ষ অথচ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তারও ইয়ত্তা নেই।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন অল্প, মাত্র ষোলো বছর, তখনই ঠাকুর-বাড়ি থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিকল্পিত সাহিত্য-পত্র 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। 'ভারতী'তে বালক রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাই প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও এসময়ে তাঁর পক্ষে কোনো সম্পাদকীয় দায়িত্ব বহন করা সম্ভব ছিল না, তথাপি 'ভারতী'র প্রথম সম্পাদক তাঁর বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাজকর্ম থেকে তিনি সম্পাদকীয় কর্তব্যের কিছু আভাস পেয়েছিলেন এবং রচনাদি সংগ্রহের ব্যাপারে তিনিই ছিলেন সম্পাদকের প্রধান অবলম্বন। 'ভারতী'র জন্যে লেখা সংগ্রহের অভিযানে বেরিয়েই বালক কবি প্রথম তখনকার দিনের খ্যাতনামা লেখকদের সঙ্গে একে একে পরিচিত হতে থাকেন এবং তাঁর সে বয়সের আদর্শ কবি বিহারীলালের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ঘটে সেই সূত্রেই। রবীন্দ্রনাথের বাল্য-রচনার অনেক কিছুই 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অবিরাম লেখায় বালক রবীন্দ্রনাথের সে সময় যেমন কোনো ক্লান্তি ছিল না, গৃহ-পত্রিকা 'ভারতী'র পাতায় সে-সব প্রকাশেও কোনো বাধা ছিল না। "ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়াছে।"—বলে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে সে সব রচনাকে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করিতে চাইলেও 'বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত ছোটোগল্প' প্রবর্তকের প্রথম গল্প 'ভিখারিনী' এবং প্রথম উপন্যাস 'করুণা' (গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত) 'ভারতী'র মাধ্যমেই জনগোচরে আনীত হয় এবং এই পত্রিকায় মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'

সম্পর্কে ষোড়শ বর্ষীয় বালক রবীন্দ্রনাথের যে দুঃসাহসিক কঠোর সমালোচনা প্রকাশ পায় তা তখনকার দিনের সুধীজনদের দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকর্ষণ করে। 'কবি-কাহিনী' নামক কাব্যও এই সময়কার রচনা।

কিছুকাল পরের কথা। রবীন্দ্রনাথ তখন তরুণ যুবক। তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হলো। সে সময় অনেকেই জানতেন যে, নামে সম্পাদক না হলেও রবীন্দ্রনাথই 'বালকে'র কর্মাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এক বছরেই 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বারোটি কবিতা, কুড়িটি প্রবন্ধ, নয়টি চিঠিপত্র, আটটি রসরচনা, 'মুকুট' নামে একটি গল্প প্রকাশ করলেন। এছাড়া ছিল 'রাজর্ষি' নামে ক্রমশ-প্রকাশিত উপন্যাসটি। শেষ দুটি রচনার কাহিনী ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিকথা থেকে গৃহীত।

এক বছরের অস্তিত্বের পরেই 'বালক' লীলা সংবরণ করে যুক্ত হলো 'ভারতী'র সঙ্গে। তখন 'ভারতী'র সম্পাদিকা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর দশ বৎসর সম্পাদনার পর সে দায়িত্ব এসে পড়ে হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীর ওপর। এই ভাগ্নেয়ীদ্বয়ের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ১৩০৫ সালে, অপর পারিবারিক পত্র 'সাধনা' বন্ধ হবার আড়াই বছর পর। 'ভারতী' সম্পাদনার কালকে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই রবীন্দ্রনাথের গদ্যযুগ বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ 'ভারতী' সম্পাদনার এক বছরে অল্প কয়েকটি গান ও কবিতা ছাড়া কবি কোনো উল্লেখযোগ্য কাব্য রচনা করেন নি। 'বালকে'র প্রকাশ বন্ধ করবার কোনো যৌক্তিক হেতু ছিল না। আপনার ক্ষমতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ই এর জন্যে দায়ী। তিনি নিজে কোনো কিছু গড়ে তুলতে পারেন, এমন ভরসা যুবক বয়সে তাঁর ছিল না। লক্ষ্য করবার

বিষয়, এই আত্মসন্দিহান যুবকটিই পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর মতো বিরাট একটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

'বালক' উঠে যাবার পরে এল 'সাধনা'র যুগ। এই 'সাধনা' ঠাকুরবাড়ির তৃতীয় সাহিত্য-পত্র। রবীন্দ্রনাথের বড়োদাদার তৃতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সম্পাদক; কিন্তু নামেই। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথকেই 'সাধনা' সম্পর্কিত যাবতীয় কাজকর্ম দেখতে হতো, 'সাধনা'র অর্ধেকটাই তাঁর লেখায় পূর্ণ হতো, এবং তাঁর রচনাই ছিল প্রধান আকর্ষণ। শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'সাধনা'র সম্পাদক হয়েছিলেন। 'সাধনা'তে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য, পল্লীসমাজ ও রাজনীতি-বিষয়ক যে সকল মন্তব্য ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতেন, তা একদিকে যেমন ছিল সাহিত্য-রসোচ্ছল, অপরদিকে তেমনই সুতীক্ষ্ণ শ্লেষ-কণ্টকিত। এই বিষয়ে বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠির অংশবিশেষ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি লিখছেন, "অনেকগুলো কথা বলা আবশ্যক অথচ বড় বড় লোক সবাই নীরব, এবং তাঁদের মধ্যেও দুই একজন নতুন নতুন বুলি বের করছেন। একে ত' বাঙালীর বুদ্ধি খুব পরিষ্কার তা নয়, তারপর সম্প্রতি হঠাৎ একটা আধ্যাত্মিক কুয়াশা উঠে চারিদিক আচ্ছন্ন করে দিয়েছে—সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য এবং সত্য একেবারে লোপ পেয়েচে। দিনকতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েচে।" বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থিত নব্য-হিন্দুদলের চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ব্যক্তিদেরই রবীন্দ্রনাথ সেকালের 'আধ্যাত্মিক কুয়াশা' সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করেছিলেন এবং 'আহারতত্ত্ব' প্রভৃতি বিষয় নিয়ে 'সাধনা'র মাধ্যমে তাঁদের অবৈজ্ঞানিক যুক্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। "য়ুরোপ যেমন মেশিনযন্ত্রের ভার বহন করিয়া চলিতেছে, তেমনি ভারতবর্ষ শাস্ত্রের ও বিধিনিষেধের ভার বহন

করিতেছে।" এমনি সব আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ নতুন আলোকপাত করে চলেছিলেন 'সাধনা'র মধ্যে দিয়ে। তাঁর দ্বিতীয়বারের বিদেশ ভ্রমণ আড়াই মাসের 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী'ও রোজনামচা হিসাবে এই 'সাধনা'পত্রেই প্রথম সংখ্যা থেকে প্রকাশ হতে শুরু হয়। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ও 'দালিয়া' প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত গল্প এবং 'হিন্দুধর্ম' ও 'স্ত্রী মজুর' প্রভৃতি সমস্যা বিষয়ক আলোচনা 'সাধনা' যুগে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা।

'সাধনা'র পর 'ভারতী'র দায়িত্বভার হাতে নেবার পরেই সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের কঠোর দৃষ্টি বিদেশী সরকারের এক কূটচক্রান্তের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ভারতীয় ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইংরেজের দানকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিলেও সেই ঐক্যসূত্র যাতে সুদৃঢ় না হতে পারে তার জন্যে ইংরেজ সরকারের কারসাজি রবীন্দ্রনাথের নজর এড়ায় নি এবং 'ভারতী'র মাধ্যমে তিনি সেই ব্রিটিশ চক্রান্তের যে সব সমালোচনা করেছিলেন সেগুলো যে কত দূরদর্শিতার পরিচায়ক বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আজ আমরা তা প্রত্যক্ষতই উপলব্ধি করছি। ইংরেজ শুধু হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি করেই নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, যতরকমে সম্ভব প্রাদেশিকতাকে তারা প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে ভারতবাসীর মধ্যে সবল রাষ্ট্র-চেতনা যাতে দানা বেঁধে উঠতে না পারে। ভাষা ও সাহিত্যের সাংস্কৃতিক বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়বন্ধন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পূর্বভারতে বঙ্গদেশ আসাম ও উড়িষ্যাকে এক ভাবসূত্রে আবদ্ধ করে নিয়ে যেভাবে এক শক্তিকেন্দ্র সৃষ্টি করে চলছিল বিদেশী শাসকের কাছে তা অভিপ্রেত ছিল না এবং তাই তাঁরা পূর্বাঞ্চলে ভাষার বিভেদ আরোপ করে বিচ্ছেদের প্রাচীর রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। তারই প্রতিবাদে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে লিখলেন, "উড়িষ্যা ও আসামে বাংলা শিক্ষা যেরূপ সবেগে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বাধা না পাইলে বাংলার এই দুই উপরিভাগ ভাষার

সামান্য অন্তরালটুকু ভাঙিয়া একদিন গৃহবর্তী হইতে পারিত।" কিন্তু তা হবার নয়, কারণ সরকারের অশুভ প্রচেষ্টা সে পথে প্রচণ্ড বাধা। দুইটি উপভাষাকে পৃথক সন্তানদানের অপকৌশলের নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ তাই শেষ মন্তব্য করলেন, "যে ভাষা ভ্রাতাদের মধ্যে ভাবপ্রবাহ সঞ্চারের জন্য হওয়া উচিত তাহাকেই প্রাদেশিক অভিমান ও বৈদিশিক উত্তেজনায়, পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীরস্বরূপ দৃঢ় ও উচ্চ করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা—তাহাকে স্বদেশ-হিতৈষিতার লক্ষণ বলা যায় না এবং তাহা সর্বতোভাবে অশুভকর।"

'ভারতী' যুগে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে যে সমস্ত আলোচনা ও ভবিষ্যবাণী প্রকাশ করেছেন সে সবের গুরুত্ব সমসাময়িকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, কালের গণ্ডী উত্তরণ করে গেছে এবং এখানেই তাঁর সম্পাদকতার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশচন্দ্র ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পুনরুজ্জীবিত করবার সংকল্প করলে 'বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে' প্রতিফলিত করার উদ্দেশ্যে ১৩০৮ সালের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সাহায্য করবার জন্যে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনায় অগ্রসর হয়ে এলেন। 'বঙ্গদর্শনে'ই রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো। এছাড়া 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর কত যে শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার সংখ্যা নিরূপণ করা সুকঠিন। আমাদের সমাজ-জীবনে বাধাবিপত্তির শেষ নেই, সমস্যার নেই অন্ত। ভারতের মূলগত ঐক্য ও বৃহত্তর মানবধর্মের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ এবং যুক্তিধর্মী লেখনী এই সমস্ত সমস্যার মূলসূত্র নিয়ে আলোচনা করেছে, তার সমাধানের ইঙ্গিতও তাঁর এই সময়কার রচনায় রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে যে আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন সেকথা একালের অনেকেরই জানা নেই এবং তা জানার প্রয়োজনও অনেকে বোধ করেন না। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করে সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি পর পর এই পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন একাধিক কারণে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মে ব্রাহ্ম হিসাবে তিনি একদিকে যেমন 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' প্রবন্ধে তখনকার দিনের 'প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আচরণে'র নিন্দা করে 'চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে হারানো চেতনা' পুনরুদ্ধারের ব্যাকুলতাকে ভাষা দিয়েছেন, ঠিক তেমনি আবার সাংস্কৃতিগতভাবে হিন্দুত্বের অধিকারীরূপে তিনি মহা গৌরবে 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের বিশ্ববোধকে জোরালো ঘোষণায় অভিনন্দিত করেছেন। 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক হয়েই পত্রিকাখানিকে রবীন্দ্রনাথ বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মুখপত্ররূপে প্রকাশ করতে থাকেন। এর ফলে আশ্রমের আবাসিকদের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয়ে ওঠে এবং 'ধর্মের অর্থ', 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়', 'ধর্মশিক্ষা' প্রভৃতি আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সকলের সামনে ভারত-সংস্কৃতির মূল সত্যকে ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরতে থাকেন। সাংবাদিকের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির সাহায্যে তিনি ভারত-ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ভারত-মনীষীরা চিরকাল মৈত্রীর কথা মিলনের কথাই বলেছেন —বিরোধের বা বিচ্ছেদের পথকে তাঁরা কখনো শ্রেয় বলে মনে করেন নি। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণের জন্যেই সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথের জীবনে 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'র যুগটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বদেশী পণ্য প্রচার মানসে এবং প্রাথমিক শিক্ষা, জলকষ্ট, পথসংযোগ প্রভৃতি নানাজাতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার্থ

'ভাণ্ডার' নামে একটি মাসিক পত্র কেদারনাথ দাশগুপ্ত নামক এক যুবকের উদ্যোগে প্রকাশিত হলো। সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। এই পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গীতগুলো প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ইহার লেখকদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃথ্বীনাথ রায় প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ। কেবল সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মারফৎ থিওরি আউড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্তব্য সমাপন করেননি। স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে স্বদেশী পণ্যের একটি ভাণ্ডার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর উপরে 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকের দায়িত্ব তো ছিলই ; একক হয়েও রবীন্দ্রনাথ কী করে এই গুরু দায়িত্ব নিপুণ-ভাবে সম্পাদন করতেন, সেটা ভাবতেও বিস্ময় বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার সাংবাদিক প্রবন্ধাদি থেকে এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত করতে পারলে এই আলোচনাটির গৌরব বৃদ্ধি হতো সন্দেহ নেই, কিন্তু স্থানাভাব।

পরিণত বয়সে বার্ধক্যজনিত শারীরিক অপটুতা হেতু রবীন্দ্রনাথ কোনো পত্রিকা প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদন করতে পারেননি বটে, কিন্তু বহু পত্রিকাই তাঁর রচনা-গৌরবে ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় ধন্য হয়েছে। 'প্রবাসী' পত্রিকার তিনি কিরূপ নিয়মিত লেখক ছিলেন, সেকথা পাঠকমাত্রেরই জানা আছে। তাছাড়া যতদিন 'সবুজপত্র' ছিল ততদিন 'সবুজপত্রে', যখন 'বিচিত্রা' ছিল তখন 'বিচিত্রা'য় এবং 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখে গেছেন। এর থেকেই প্রমাণিত হবে, এদেশীয় সাময়িকপত্রগুলোর উপর তাঁর দরদ ছিল কতখানি নিবিড় এবং আন্তরিক।

'সবুজপত্রে'র যুগে রবীন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হয়ে 'শান্তিনিকেতন' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন 'কেবলমাত্র আশ্রমের ছাত্র ও আত্মীয়দিগকে' লক্ষ্য করে বিভিন্ন লেখকদের বিবিধ রচনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। আগের বছর শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত ছোট

ছাপাখানা থেকেই পত্রিকাখানির প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৩২৬ সালের প্রথম মাস থেকে এবং এই পত্রিকাখানিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'বিশ্বভারতী', 'ধর্মোপদেশ', 'শিক্ষার আদর্শ', 'কলাবিদ্যা', 'অসন্তোষের কারণ', 'বিদ্যাসমবায়', 'ইংরেজি শিক্ষা', 'ভাষা ও ভাষান্তর', 'বিলাতযাত্রীর পত্র' প্রভৃতি রচনা ছাপা হয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতারও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সতর্কপ্রহরী। উনবিংশ শতাব্দীর অন্তকালে তিলক মহারাজের কারাদেশের বিরুদ্ধে যখন সারা দেশ জুড়ে একটা আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠতে থাকে সেই সময় উদ্যত রোষে বিজাতীয় সরকার 'সিডিশন বিল' ও 'সিক্রেট প্রেস কমিটি' নামক দুই শাণিত অস্ত্রে সেই আন্দোলন দমনে অগ্রসর হলেন। প্রতিবাদে 'ভারতী' সম্পাদক লিখলেন 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ। স্বাধীন সংবাদপত্রের আবশ্যকতা যে কত তা নানা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। "সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না।······রহস্যই অনিশ্চিত ভয়ের প্রধান আশ্রয়স্থান······রুদ্ধবাক্ সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়ই ভয়ংকর অবস্থা।" একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের পক্ষেই এই 'ভয়ংকর অবস্থা' যথার্থভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব, রবীন্দ্রনাথও সম্পাদক হিসাবেই তখনকার সেই অবস্থা যথাযথ হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর তিরোভাবে সাহিত্য জগতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তার চেয়ে কম হয়নি, একথা বলায় কোন অত্যুক্তি নেই।

রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্য

খোকা মাকে শুধোয় ডেকে—
“এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?”

মা এর উত্তর দিলেন,—
“ইচ্ছে হ’য়ে ছিলি মনের মাঝারে।”

শিশু-মনের এই জিজ্ঞাসা এবং মায়ের উত্তরের মধ্যে বাৎসল্য-রসের যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্যকে তা চিরকালই অনন্য করে রাখবে।

পৃথিবীর কাব্যেতিহাসে প্রেমের কবিতাই এ যাবৎ শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছে। এর কারণ বোধ করি এই যে, মানুষের জীবনে প্রেমের অনুভূতিই সব চেয়ে তীব্র, সুতরাং সত্য। মানুষ-মাত্রের মধ্যেই যে আদিম উদ্দামতা আছে, সেইটেই প্রেমের কবিতার প্রাণ; ফলে মানব-মন তার মধ্যে আপন মনের একটা সহজ প্রতিধ্বনি খুঁজে পায়। প্রেমের কবিতার জনপ্রিয়তাও কতকটা এই কারণে।

কিন্তু প্রেমই মানুষের জীবনে একমাত্র ধ্রুব সত্য নয়। মানুষের আবেশের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে,—তার স্নেহ আছে, দয়া আছে, মায়া আছে, বাৎসল্য আছে। এই বাৎসল্যরস থেকেই ‘শিশু’ কবিতার জন্ম। আর মায়ের এই বাৎসল্য নিয়েই যে শিশুর জগৎ। তাই মাকে বাদ দিয়ে কোনো কিছুই তার কাছে সত্য বলে মনে হয় না। মেঘের ডাকে সারা দিতে না পেরে তাই সে বলে—

মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে।

...　...　...

আমি বলি মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে,
তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে?

... ...

তার চেয়ে মা আমি হব মেঘ
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ
দু হাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে
আকাশ হবে আমাদের এই ছাদ!

শিশুদের প্রতি কবির বিশেষ পক্ষপাত বিজ্ঞাপনের প্রতীক্ষা রাখে না। প্রধানত তাদেরই জন্যে তিনি আশ্রমিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন। শিশুদের সঙ্গে মেলামেশায় তাঁর ছিল অপার আনন্দ। যত তাঁর বয়স বেড়েছে ছোটদের সঙ্গে মেশবার নেশাও যেন তাঁর ততই বেড়েছে। তাই তো বুড়ো হয়েও ছোটদের উদ্দেশ্যে তিনি রহস্য করে বলেছেন—

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি সমবয়সী জেন।

সত্যি কথা শিশুদের সমবয়সী হয়ে থাকার একটা সাধ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মনে জেগে ছিল। তাদের খুশির জন্যে তিনি মুখে মুখে অনেক 'ছড়ার' সৃষ্টি করে গেছেন। ছেলেমানুষের সকৌতূহল বহু প্রশ্নের উত্তরে সহাস্যে দীর্ঘ কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। 'শিলং-এর চিঠি' তার সাক্ষ্য।

শিশুদের জন্যে কবি যখনই কিছু লিখতে বসতেন তখনই তিনি শিশু মনোরাজ্যে বাসা বেঁধে নিতেন। একখানা চিঠিতে সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। বলেছেন, 'আমি আজ শিশুদের মনের ভিতরে বাসা করে আছি। তেতলার ছাদের উপর আমার

নিজের শৈশব মনে পড়ছে।' তারই স্পষ্ট অভিব্যক্তি রয়েছে 'খোকার রাজ্য' কবিতায়।

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে—
তবে আমি একবার জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি সে নিভৃতে।

আর শিশুদের জন্যে লিখতে লিখতে তাঁর নিজের ভিতর যে বালকাণ্ড রয়েছে তার সঙ্গে পরিচয়ও যে নিবিড়তর হয়ে উঠছে সে কথাও কবি আর একখানি পত্রে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতাগুলোর মধ্যে তিনটি শ্রেণী বিদ্যমান। প্রথম হলো শিশুকে তিনি যে চোখে দেখেছেন। শিশুদের মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন সদানন্দময়, নিরাসক্ত মনের খেলা। যারা আছে চির-রবিবারের রাজ্যে। যারা হিসাব জানে না, নিকাশ জানে না; অকারণে গড়ে, অকারণে ভাঙে, আপশোষ করে না। সমুদ্রতীরে তারা নুড়ি কুড়িয়েই খুশি,—ঢেলা পাওয়াই তাদের লাভ,—রত্ন পেলে না বলে তাদের দুঃখ নেই,—জ্ঞানবৃদ্ধের মতো জাল ফেলাও তাদের স্বভাবের বাইরে।

তবে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে মাতৃহারা রবীন্দ্রনাথের মনে তাঁর ছেলেবেলার কথা ছবির মতো ভেসে উঠলেই মাকে তিনি বিশেষ ভাবে অনুভব করতেন এবং অনেক সময় সেই ছোটবেলায় খেলার চেয়েও মায়ের আকর্ষণ তিনি বেশি বোধ করতেন।

তোমায় মনে পড়ে গেলো
ফেলে এলাম খেলা।
আজকে আমার ছুটি,
আমার শনিবারের ছুটি
কাজ যা আছে সব রেখে আয়
মা তোর পায়ে লুটি।

শিশুকে কবি কত কোমল অনুভূতি নিয়ে দেখেছেন,—

ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন মার্জনা।

তাদের দুরন্ত স্বভাবটুকুকেও কবি ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও প্রশ্রয়ের আলোতে বরণীয় করে তুলেছেন। বলেছেন—ঘরে যদি দুরন্ত কেউ না থাকে, 'কোন মতে হয় না তবে বুকের শূন্য পূরণ তো'। শিশুর দুষ্টুমি হলো তুফান জাগানো দখিন হাওয়া,— হৃদয়ের ফুলবাগানে তা দোলা দিয়ে যায়।

শিশুকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ মাতৃস্নেহের যে মধুর রূপটি এঁকেছেন, তা সুষমায় স্বর্গীয়, লাবণ্যে কমনীয়। মাতৃহৃদয়ের সমস্ত সুখদুঃখ, আনন্দ সব শিশুকে ঘিরে উঠেছে লতার মতো।

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে।

প্রশ্রয়ের ভাবটি চমৎকার ফুটেছে 'অপযশ' কবিতাটিতে। খোকা গায়ে কালি মেখেছে বলেই সে যদি নোংরা হবে, তবে পূর্ণশশীও ওই একই দোষে দোষী। খোকা যদি খেলতে গিয়ে কাপড় ছিঁড়ে এসেই থাকে, তাতে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হলো না—ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে, সেকি লক্ষ্মীছাড়া? রবীন্দ্রনাথের মা শাসনেরও বিশেষ পক্ষপাতী নন, যে শাসনে সোহাগ নেই, তা যে অত্যাচারেরই নামান্তর!

এতো গেল শিশুর প্রতি কবির মনোভাবের দিক। কিন্তু আরো মর্মস্পর্শী হয়েছে পৃথিবীর প্রতি শিশুদের মনোভাব যখন তিনি আলোচনা করেছেন। শিশুরা পৃথিবীকে দেখে অর্ধ কৌতূহলে, অর্ধ বিস্ময়ের ভাবে। পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের প্রশ্নের

শেষ নেই। তারা অসম্ভবে বিশ্বাসী। সন্ধ্যাবেলা কদম গাছের ডালে আটকাপড়া চাঁদ ধরে আনা যে বিশেষ শক্ত কাজ কিছু নয়, একথাটা সে যুক্তিসমেত প্রমাণ করে দিতে জানে। শিশু-মন বন্ধনের বৈরী। কোনো বাঁধাধরা নিয়মকেই সে মেনে চলতে রাজী নয়। বন্দী-কাল দুপুরবেলাকে মা কিছুতেই সন্ধ্যা বলে ভাবতে না পারলেও ছুটির ব্যাকুলতায় শিশু কিন্তু তা অতি সহজেই পারে।

তুমি বলছ দুপুর এখন সবে
না হয় যেন সত্যি হল তাই,
একদিনো কি দুপুরবেলা হলে
বিকেল হল মনে করতে নাই?
আমি ত বেশ ভাবতে পারি মনে
সূয্যি ডুবে গেছে মাঠের শেষে,
বাগদি বুড়ি চুবড়ি ভরে নিয়ে
শাক তুলছে পুকুর ধারে এসে।

ছুটির আনন্দে কোন শিশু না আত্মহারা হয়ে ওঠে? বিশেষত পূজোর ছুটিতে মেঘমুক্ত আকাশের হাতছানি তাকে সারাদিনের জন্যে ঘড়ছাড়া করে নেবেই—এমন দিনে কোনো কাজ নয়, মনের আনন্দে শুধু বাঁশী বাজিয়েই সে গোটা দিন কাটিয়ে দেবে। কারণ—

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি।

শাসনের প্রতি তার বিরাগের সীমা নেই। পাঠশালার কারাগৃহ থেকে সে ফেরিওয়ালার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তাকে তো বাধা দেবার কেউ নেই।

নেই বা হ'লেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোঁসাই!

আমি তো, মা, চাইনে হতে
পণ্ডিত মশাই!

পণ্ডিতমশায় গুরুমশায়দের সম্পর্কে শিশুদের যে স্বাভাবিক বিরূপতা ও বিরাগকে রবীন্দ্রনাথ নানা কবিতায় প্রকাশ করেছেন সেগুলোতে তাঁরই নিজের বাল্যস্মৃতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। শিশুর অবাধ আনন্দ-উচ্ছলতাকে যাঁরা পদে পদে বাধা দিতে তৎপর 'বাবার মত বড়' না হলে তাঁদের যে শায়েস্তা করা সম্ভব নয় ছোট রবির মনেই সে চিন্তা আন্দোলিত হয়েছিল। সেই সময়ের মনের ভাবটিকেই কবি কী অপূর্ব পরিবেশে ফুটিয়ে তুলেছেন—

গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
চৌকি এনে দিতে বলব ঘরে;
তিনি যদি বলেন, 'সেলেট কোথা।
দেরী হচ্ছে, বসে পড়া কর।'
আমি বলব, 'খোকা ত আর নেই
হয়েছি যে বাবার মত বড়।'
গুরুমশায় শুনে তখন কবে—
'বাবুমশায় আসি এখন তবে।'

বাবার ওপর এইরূপ নির্ভরতা বা ভরসাই শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথের শিশু পিতৃভক্তিতেও রামের তুলনায় কম যায় না। পিতৃসত্য পালনে রামায়ণের রামচন্দ্রের মতো সেও বনে যেতে প্রস্তুত।

বাবা যদি রামের মত পাঠায় আমায় বনে
যেতে আমি পারিনে কি তুমি ভাবছ মনে?

কিন্তু এমন পিতৃভক্ত শিশু বাবার সঙ্গে মায়ের যেখানে বিরোধ সেখানে সে মায়ের পক্ষে। বাবা বিদেশে গিয়ে মাকে কষ্ট দেন, শিশু তা সহ্য করতে পারে না। তাই সে মাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'বাবার মতন যাব না মা বিদেশে কোন কাজে।' শুধু কি তাই?

বাবার চিঠির জন্যে মায়ের অস্থিরতা দূর করার উদ্দেশ্যে সে নিজেই মোটা মোটা হরফে বাবার হয়ে চিঠি লিখে যা করবে তাও কি বড় কম অপূর্ব !

চিঠি লেখা হলে পরে বাবার মত বুদ্ধি করে
ভাবছ দেবো ঝুলির মধ্যে ফেলে।
কখ্খন না আপনি নিয়ে যাব তোমায় পড়িয়ে দিয়ে
ভাল চিঠি দেয় না ওরা পেলে।

রবীন্দ্রনাথের শিশু আবার সাহিত্য-সমালোচকও বটে। শিশুরা রূপকথার কাঙাল, ছড়ার তৃষ্ণা তাদের অন্তহীন। কিন্তু 'বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে।' তাহলেও সে সব বইয়ে না আছে ছড়া, না আছে রূপকথার গল্প—সেগুলো বোধগম্যই নয়। তাই শিশু তার মাকে জিজ্ঞেস করছে, 'এমন লেখায় তবে বল দেখি কি হবে।'

শিশু চায় সব কিছু বাধা ডিঙিয়ে বাইরেকার গাছপালা, মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতে। 'ডাকঘরে'র অমলের মধ্যে আমরা সেই মুক্তিপিপাসু শিশু-প্রকৃতির দেখা পেয়েছি।

এ ছাড়া আরেক ধরণের কবিতা আছে, যা একান্তই শিশুদের পাঠের উপযোগী। 'ছড়ার ছবি' সেই জাতের। হঠাৎ মিলের ঝিলিমিলি দিয়ে কবি বইটিকে এঁকেছেন। এর লাইনে লাইনে চমক, প্রতিটি বাঁকে বিস্ময়।

ঘাসে আছে ভিটামিন,
গরু ভেড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে
আঁখি মেলে পশ্য।

এ সব লাইন যে ছেলেদের উচ্ছ্বসিত করে তুলবে, তাতে সন্দেহ নেই। আর যেখানে প্রশ্ন করেছেন 'অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি ?'—এবং উক্ত দামোদর শেঠের খুশির জন্যে ভেটকি এবং

আরো বিবিধ চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আয়োজন করবার পরামর্শ দিয়েছেন,—এবং সবার শেষে বলেছেন,—'খোঁজ নিও ঝরিয়াতে জিলিপির রেট্ কি ?'—এর পরেও দামোদর শেঠ যদি খুশি নাও হয়, ছেলেরা যে হবে, বলাই বাহুল্য।

খ্যান্ত বুড়ীর দিদিশাশুড়ীর কালনাবাসী তিন বোনের অসামাজিক আচরণের যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, বিজ্ঞ রিয়ালিস্ট তাতে সন্দেহের ভ্রূকুটি অবশ্যই করবেন। কিন্তু যে শিশুচিত্ত 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে'য় এলো বান' দেখে উদাস হয়ে আছে এবং সেই সঙ্গেই যার

মনে পড়ে সুয়োরানি দুয়োরানির কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।

রাজপুত্তুর যার বন্ধু, তেপান্তরের মাঠ যার ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর ভাষা বুঝতে যার ক্ষণকাল দেরি হয় না,—সে সহজেই রবীন্দ্রনাথের ছড়ার ছবিগুলো মনের পটে এঁকে নেবে।

খ্যান্ত বুড়ীর দিদিশাশুড়ীর
তিনবোন থাকে কালনায়
শাড়ীগুলো তারা উনুনেতে রাখে
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে তারা থাকে লোহা সিন্দুকে
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জানলায়।
নুন দিয়ে তারা ছাঁচি পান সাজে
চুণ দেয় তারা ডালনায়॥

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র একটি বিয়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন, বলা বাহুল্য, আমাদের দৃষ্ট শ্রুত কিম্বা অভিজ্ঞতালব্ধ কোনো বিয়ের সঙ্গেই তার মিল নেই। একেবারে যাকে বলে রীতিমত থ্রীলিং!

বর এসেছে বীরের সাজে
বিয়ের লগ্ন আটটা—
পেতল বাঁধা লাঠি হাতে,
গালেতে গালপাট্টা।
শালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠলো জমে
রায়বেঁশে নাচ নাচার ঝোঁকে
মার্‌ল মাথায় গাঁট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে
বর হেসে কয় ঠাট্টা॥

এ রকম অবৈধ ঠাট্টা পীনালকোডের চোখ রাঙানি থেকে রেহাই পাবে না জানি—কিন্তু শিশুদের চোখ যে খুশিতে ছলছল করছে, এ তো দেখতেই পাচ্ছি।

ছেলেদের জন্যে রবীন্দ্রনাথ গল্প বলার এক নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। তাঁর কবিতায় গল্প বলার টেকনিক 'পলাতকা', 'কথা' প্রভৃতিতেই দেখেছি। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে কবি কবিতায় গল্প বলেছেন 'ছড়ার ছবি'তে। গদ্যেও রবীন্দ্রনাথ গল্প বলেছেন। একেবারেই ছেলেদের গল্প। নায়ক রাজপুত্তুর নয়। রাক্ষসের দেশে গিয়ে সে সোনার কাঠির যাদুতে রাজকন্যার ঘুম ভাঙায় নি। এ গল্পের নায়ক সে। গল্পটি আগাগোড়াই এত চমৎকার যে এক নিঃশ্বাসেই সবটুকু পড়ে ফেলতে হয়। তার খানিকটা নমুনা তুলে দিলাম—

"সে বললে, দাদামশায়, তোমাকে একটা গান শোনাবো।

কী করি, ছবি আঁকা বন্ধ করতে হোলো।

সে শুরু করলে,—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে।

আমার মুখের ভাব দেখে তার কী মনে হলো জানিনে, জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগছে ?

আমি বললুম, আরো অনেককাল তোমাকে গলা সাধতে হবে, এর বেশি কিছু বলতে ইচ্ছে করিনে।"

আমরাও আর বেশি কিছু বলতে ইচ্ছে করিনে। সবটা না পড়লে এ বইয়ের রসভোগ করা দায়।

শিশুর যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ মনে মনে তৈরি করেছিলেন, সেটির উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

শিশুদের রবীন্দ্রনাথ কমনীয় করে এঁকেছেন বটে, কিন্তু নমনীয় করেননি। প্রতিটি শিশুর মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন একটি 'বীরপুরুষ'কে, যে তার মায়ের সম্মান রক্ষায় তলোয়ার খুলে এগিয়ে আসবে নিঃশঙ্কচিত্তে। মাকে অভয় দিয়ে সে বলবে, 'আমি আছি ভয় কেন মা করো।' ডাকাতের সঙ্গে লড়াইতে সে একেবারে দ্বিধাহীন। একবারো সে কাঁপবে না। এ আদর্শের তুলনা নেই। শিশু-বীরের 'হারে-রে-রে'র মধ্যে আমরা চিরকালের শিশুচিত্তের দুর্জয় জয়োল্লাসই শুনতে পাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্ম

জীবনে ও কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কর্মযোগী। এই কর্মসাধনার ভিতর দিয়ে পৃথিবীর মানুষের আত্মার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর জীবনধর্ম। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ পরম তত্ত্বকে তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সাধনার জন্যে 'সুন্দর ভুবনে' মৃত্যুকে কখনো কামনা করেন নি, মানুষের মধ্যে বাঁচতে চেয়েছেন। সংসারে প্রতিনিয়ত যে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ও সংযোগ-সংঘাতের খেলা চলেছে তারই মধ্য দিয়ে চলে মনুষ্যত্বের সেই সাধনা। কিন্তু একদল আছেন, যাঁরা সংসারের সংগ্রামকে করেন ভয়, পৃথিবীর সহস্র পরাজয় ও গ্লানির হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে ধর্মের দায় চুকিয়ে এঁরা নিষ্ক্রিয়তার আশ্রয় নেন। 'সংসারের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার এই ভদ্র পথ' অবলম্বনে এঁদের লজ্জা নেই, বরঞ্চ সাধারণের কাছে এসব বৈরাগী গৌরব ও শ্রদ্ধারই প্রত্যাশী। সংসার-কর্তব্যবিমুখ আবার এমন এক শ্রেণীও আছেন, যাঁরা সংসারের কতকগুলো বিশেষ রসসম্ভোগকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে চোলাই করে নিয়ে তাই পান করে জগতের আর সমস্ত কিছু ভুলে থাকতে চান, অর্থাৎ তাঁরা এমন একটি স্বর্গ চান যেখানে সংসারের ঘাত-সংঘাত নেই, যে স্বর্গ শুধু আনন্দ উপভোগের আবাস! এই উভয় মতের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের অমিল। তাঁর সন্ন্যাস-বিরোধী মন অকুণ্ঠ ভাবেই ঘোষণা করেছে যে, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, "বৈরাগ্যের নাম করে আমি শূন্য ঝুলির সমর্থন করি না। অন্নপূর্ণার সঙ্গে শিবের যে মিলন সেইটাই সত্যিকারের মিলন।" অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেও যে মহানন্দময় মুক্তি সেই মুক্তিলাভই তাঁর কাম্য, আর এই মুক্তির সাধনাই মানবধর্ম যার জয়গানে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য মুখরিত। জয়েই

জীবন, পলায়নে নয়—একথা রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন, তাই 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন করিতে পারি জয়'—এই তাঁর চিরকালের আকাঙ্ক্ষা। সংসার-রণে আপাতদৃষ্টিতে যাকে পরাজয় বলে মনে হয় তাতে মনুষ্যত্বের হানি ঘটে না, সেই পরাজয়-ভয় ও সংগ্রাম-বিমুখতাই মনুষ্যত্বের অমর্যাদা ঘটায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার অজস্রতার মধ্য দিয়ে বার বার তাঁর অন্তরের এই মর্মবাণী উচ্চারণ করেছেন।

'মানুষের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে' কবি অপরাধ বলে মনে করতেন। আপাত-পরাজয়ের পশ্চাতে মানবধর্মের জয়ের উপর এই যে দৃঢ় ভরসা এখানেই রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্মের পূর্ণ বিকাশ।

নিখিল মানবাত্মাকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভব নয়, রবীন্দ্রনাথের এই সত্য মত 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে যথার্থ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। "আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না ক'রে আপনার মধ্যেই সেই মহান্ পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা।" শুধু এই নয়, আরো স্পষ্ট করে কবি লিখেছেন, "আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। এই বুদ্ধিতে এই আনন্দে যাকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা, কিন্তু মানবিক ভূমা। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন!" এই মহামানবতাবোধই তাঁর ব্যক্তি-আত্মাকে বিশ্বাত্মার সঙ্গে সর্বদা যুক্ত রাখবার জন্যে কবিকে আকুল করে রেখেছে। তাই তো তাঁর প্রার্থনা—

> যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে
> মুক্ত করো হে বন্ধ,
> সঞ্চার করো সকল কর্মে
> শান্ত তোমার ছন্দ।

রবীন্দ্রনাথ সেই দলের "যাঁরা সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব-সমেত এই সংসারকেই সত্যের মধ্যে জেনে চরিতার্থতা লাভ করাকেই ধর্ম বলে জানেন। সংসারকে সংসারের মধ্যেই ধরে দেখলে তার সেই পরম অর্থটি পাওয়া যায় না, যে অর্থ তাকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে এবং সকল দিকে অতিক্রম করে বিরাজ করছে। অতএব কোন অংশে সত্যকে ত্যাগ করা নয়, কিন্তু সর্বাংশে সেই সত্যের পরম অর্থটিকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা ধর্ম বলে জানেন।" তাঁর ধর্মের এই আদর্শ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পৃথিবীটি বস্তুত যেমন অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাঁট দেওয়া সত্য ও ঘরগড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ আরো বেশি ; তাই অসামঞ্জস্যকেও ভয় করিনে।"

আমি যে সব নিতে চাইরে—
আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

ছোটবেলায় অন্তঃপুরের অন্তরালে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যে সহজ সহযোগিতা ঘটেছিল তারই প্রচ্ছন্ন পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের শিশুমনে জেগেছিল এক ধর্মবোধের আভাস এবং স্বভাবতই তা শান্তি ও মাধুর্যময়। কারণ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে শিশুপ্রকৃতির যে মিলন সেখানে কোনো বাধা, বিরোধ, সংঘাত বা সংঘর্ষ নেই। কিন্তু এই ছোট মিলে মানুষের চিত্ত চিরকাল পূর্ণ তৃপ্তি পায় না, তার জন্যে চাই একটি বড়ো মিল এবং এ মিল বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে আর সম্ভব নয়, সম্ভব বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে। "বড়ো-আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগল অর্থাৎ অংকুর রূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি 'সোনারতরী'র 'বিশ্বনৃত্যে'।" কেবল ছোট-আমিকে নিয়েই যখন মানুষ তৃপ্ত থাকতে চায় তখনই মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়, মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করতে

থাকে এবং দুঃখশোক এমন একান্ত হয়ে ওঠে যে, তাকে অতিক্রম করে কোথাও সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিরোধ-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে বৃহৎ ঐক্যের সন্ধান করে ফেরে কবি তাঁকে বলেছেন, শিবম্। এই যে মঙ্গল, এখানে রয়েছে মস্ত দ্বন্দ্ব। "অংকুর এখানে দুই ভাগ হয়ে বাড়তে চলেছে, সুখদুঃখ, ভালোমন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল সেটি এক, সেটি শান্তম্, সেখানে আলো আঁধারে লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাঁধল সেখানকার শিবকে যদি না জানি সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে জানার বেদনা বড়ো তীব্র। …এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তার গর্ভবাস।" বিশ্বজনের সঙ্গে মিলে-মিশে সমগ্র সুখদুঃখের, ভালোমন্দের অংশীদার হয়ে মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশেই জীবনের সার্থকতা।

বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহ আপনার স্থান—
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান।

জীবন সার্থক করার এই প্রয়াস ও প্রেরণা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বত্র। সকলপ্রকার অনাদর অসম্মান থেকে মনুষ্যত্বের মুক্তি-প্রয়াস যেখানেই কবি লক্ষ্য করেছেন সেখানেই তিনি আনন্দ-চঞ্চল হয়ে উঠেছেন—তাঁর লেখনী মুখর হয়ে উঠেছে। তেমনি মুখরতারই একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় 'রাশিয়ার চিঠি'তে সোভিয়েৎ শিশুদের সঙ্গে তাঁর মিলনের একটি বর্ণনায়। তিনি লিখছেন, "বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখি আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সিঁড়ির দুধারে বালক বালিকার দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আসতেই ওরা আমার চারদিক ঘেঁষাঘেষি করে বসল, যেন আমি ওদেরই আপন দলের। একটা কথা মনে রেখো—এরা সকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে শ্রেণী থেকে এসেছে একদা সে শ্রেণীর মানুষ কারো কাছে কোনো যত্নের দাবি করতে পারত না,

লক্ষীছাড়া হয়ে নিতান্ত নীচ বৃত্তিদ্বারা দিনপাত করত। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, অনাদরের অসম্মানের কুয়াশা-ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সংকোচ নেই, জড়তা নেই। তা ছাড়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা পণ, সামনে একটা কর্মক্ষেত্র আছে বলে মনে হয়; যেন সর্বদা তৎপর হয়ে আছে, কোনো-কিছুতে অনবধানের শৈথিল্য থাকবার জো নেই।”

রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্ম ‘বাঁশির তানেই মোহিত; তার ঝোঁকটা প্রধানত শান্তির দিকেই, শক্তির দিকে নয়’, এই সমালোচনার উত্তর কবি নিজেই দিয়েছেন তাঁর ‘আত্মপরিচয়’ গ্রন্থে। কবি দেখিয়েছেন যে, যে প্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে, দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই প্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষা ‘চিত্রা’য় ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ—

যেদিন জগতে চলে আসি’
কোন্ মা আমারে দিল শুধু
এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই
মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু
একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসার-সীমা।

মাধুর্যের শান্তি যে এ কবিতার লক্ষ্য, তা নয়। এ কবিতায় যার অভিসার সে কে?

কে সে? জানিনা কে।
চিনি নাই তারে—

শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি
রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে
যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে,
জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।

'এর পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানব চিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল।' দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয়, সে তো বাঁশির ললিত সুর নয়! তাই সেই সুরের জবাবেই আছে—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা
ওরে রক্ত লোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে
শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী?

এ আহ্বান, এ তো শক্তিকেই আহ্বান, কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক; রস-সম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়—সেই জন্যেই এর শেষ উত্তর—

হবে, হবে, হবে জয়
হে দেবী করিনে ভয়
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান বাণী
সফল করিব রাণী
হে মহিমময়ী।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ উপচেতনলোকের অন্ধকার থেকে ধীরে

ধীরে চেতনলোকের আলোকধারায় স্বচ্ছ হয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। তবু পদে পদে পথ ভুল, কোথায় যে যাওয়া হবে—কী যে শেষ লক্ষ্য তার ঠিক নেই। 'কখনো উদয়-গিরির শিখরে, কভু বেদনার তমোগহ্বরে' রবীন্দ্রনাথ পাগলের মতো হয়ে অজানা পথ ধরেই এগিয়ে চলেছেন জীবন দেবতার সন্ধানে। এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্বজীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় আসনটি পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে দুঃখ-দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে একটা নতুন বোধ দেখা দিল ঝড়ের বেশে। 'বর্ষশেষ' কবিতায় রয়েছে তারই বর্ণনা—

পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি
বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ
হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে।

এর পর থেকে রবীন্দ্র-কাব্যে দুঃখ-বিপদ-বিরোধ-মৃত্যুর বেশে বার বার অসীমের আবির্ভাব দেখা গেছে—

কহ মিলনের একি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
তার সমারোহভার কিছু নেই
নেই কোন মঙ্গলাচরণ?

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অসীমের সঙ্গে যে মিলন তাতে সমারোহ বা মঙ্গলাচরণের কী আর দরকার? 'খেয়া'র 'আগমন' কবিতায়ও

কবি অশান্তিরই মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। এই বইয়ের 'দান' কবিতায় কবি ফুলের মালা প্রার্থনা করে পেয়েছেন—

এতো মালা নয় গো, এযে
তোমার তরবারি।

"এমন যে দান, এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকার জো আছে? শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়।" এ কথাই রবীন্দ্রনাথ পরে আরো পরিষ্কার করে বলেছেন। "রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হতো তা'হলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না। তাহলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়? তাইতো মানুষ তাঁকে ডাকছে—রুদ্র যত্তে দক্ষিণাং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ।" সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে এবং সেই সত্য লাভই হচ্ছে জীবনের একমাত্র কাম্য। 'সীমার সার্থকতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "জীবনে একটি মাত্র কথা ভাবিবার আছে যে আমি সত্য হইব। আমি কবি হইব কি আরও কিছু হইব, সেটা নিতান্তই ব্যর্থ চিন্তা। সত্য হইব, এই কথার অর্থ এই, কোথায় আমার সীমা, সেটা নিশ্চিত রূপে অবধারণ করিব। দুরাশার প্রলোভনে সেইটা সম্বন্ধে যদি মন স্থির না করি, তবে সত্য ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট হইব। ...আমরা নিজের সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের সাধনা। কারণ, সেই অসীমেরই আনন্দ আমার মধ্যে সীমা রচনা করিয়াছেন, সেই সীমার মধ্যে তাঁহার বিলাস, তাঁহার বিহার, তাঁহার সেই নিকেতনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বেশী করিয়া পাইব, এই কথা মনে করাই ভুল।...অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর।" এই সীমার মধ্যে অসীমকে আবিষ্কার করার অর্থই সত্যকে আবিষ্কার করা এবং 'নানা পথে নানা দুরাশার বিক্ষিপ্ততা' থেকে নিজেকে সংহত করে

আপনাকে স্পষ্ট করে পাওয়া। রবীন্দ্রনাথ এই অধ্যাত্ম সাধনাকেই মানুষ হওয়ার সাধনা বা মানুষের সাধনা বলে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এ সাধনার মাধ্যমে সেই পরম সত্যে পৌঁছুতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে তো সত্য নয়। তাই রুদ্রকে ভয় করলে চলবে কেন?

হঠাৎ যখন—

পাঠালে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
তব আহ্বান করি' সে বহন
পার হ'য়ে এল পারে।

তখন দূতের মূর্তি দেখে প্রথমটায় ভয় হলো, কিন্তু প্রিয়তমের দূত বলে চোখের জল মুছে তাঁকে বরণ করে ঘরে নিতেই দেখা গেল, এতো শুধু দূত নয়, এ যে আমারই রুদ্র-বেশী প্রিয়তম। এমনি অবস্থায়—

প্রথম মিলন-ভীতি ভেঙ্গেছে বধূর
তোমার বিরাট-মূর্তি নিরখি মধুর।

জীবন দেবতা কবির কাছে যখনি যে বেশে আসুন না কেন, তিনি তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকেন নি। এমন কি মৃত্যুকেও কবি পরম আত্মীয় রূপেই চিনে নিয়েছেন। 'জীবন মৃত্যু দুই-ই কবির কাছে বিশ্বেশ্বরের কোল।'

ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও
বাম হস্ত হ'তে ডানে।
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে কর কেবা জানে!

কিন্তু বিশ্বেশ্বরের কোল থেকে কিছুই নষ্ট হয় না একথা কবি নিশ্চিত ভাবেই জেনেছেন।

হারায়নি কিছু ফুরায়নি কিছু
যে মরিল যেবা বাঁচিল।

তবু অজ্ঞান মানুষ তার চিরপরিচিত জীবনকে ছেড়ে যেতে চায় না, অজ্ঞাত 'মৃত্যুর মাধুরী' উপলব্ধি করা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য। জীবন-মৃত্যুর বিরোধ তাই তার কাছে ভয়ংকর। কিন্তু যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙ্গে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তাঁর সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

এর পরেও কি করে বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বাঁশির তানেই মোহিত; তাঁর ঝোঁকটা প্রধানত শান্তির দিকেই, শক্তির দিকে নয়? রবীন্দ্রনাথ যে মুক্তির আনন্দ-প্রত্যাশী সে আনন্দ বৈরাগ্যের নয় বা দুঃখকে বাদ দিয়ে নয়, 'দুঃখকে-আত্মসাৎ-করা' আনন্দ।

চরম আশাবাদই রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্মের ভিত্তি। তাই চতুর্দিকের স্বার্থ-সংঘাতেও তাঁর মন অটল। কারণ তিনি জানেন, মানবলোকের 'এই যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব—মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ; এই যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্মবোধই' তার সত্যকার সমাধানে সক্ষম এবং এই সমাধানকেই কবি বার বার 'পরম শান্তি, পরম মঙ্গল ও পরম এক' বলে অভিহিত করেছেন।

বাস্তব দৃষ্টিতে আমরা যাকে শেষ বলে মনে করি তাই শেষ নয়, তারপরেও অশেষ রয়েছে। মৃত্যু অফুরন্ত অনন্ত জীবনেরই একটা ঘাট বা ঘাঁটি মাত্র। "তাই মানুষের সভ্যতায় তার যে

জীবনটা বিকশিত হয়ে উঠেছে, সেতো কেবল মৃত্যুকে ভেদ করে।” জ্ঞানী মানুষ তাই বলে—

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে
তারপর সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

এ যেন সেই নদীর মতো, যে দুই কূলে শ্যাম সমারোহ পরিবেশন করে সব কাজ সমাধার পর তার অন্তহীন ধারায় সিন্ধুর চরণে জলাঞ্জলি অর্পণ করে।—

নদী ধায় নিত্য কাজে, তার সর্ব কর্ম সারি'
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়,—
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি' তব পূজা নহে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্মের মূল কথাই এই। বিরাটের সঙ্গে মিলনের তাঁর যে আকাঙ্ক্ষা তা সংসারকে উপেক্ষা করে নয়, সংসারের সহস্র সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়েই মানুষকে জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ করতে হবে, তবেই ভূমাকে জানা যাবে, মৃত্যুকে লঙ্ঘন করা যাবে—এই তাঁর বাণী। উপনিষদের অমৃতবার্তায় ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্তপুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথে নাহি॥

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকং নীড়ম্ ॥"

'বিশ্বভারতী' আজ সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ-বিদেশে সর্বত্র এর কথা প্রচার করেছেন, এর সাফল্যের জন্যে সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন। ১৯২১ সালে এই 'বিশ্বভারতী'র উদ্বোধন হয়।

বিশ্বভারতী শব্দটির অর্থ বিশ্বের সংস্কৃতির ও শিক্ষার পীঠ। "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকং নীড়ম্ ॥"—সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান-সন্ধানী পক্ষপুট এখানে একটি নীড়—একটি আশ্রয় পাবে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে—"Visvabharati represents India where she has her wealth of mind which is for all. Visvabharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best."

বিশ্বভারতীর উদ্ভব শান্তিনিকেতন থেকেই। একদা শান্তিনিকেতনের দৃশ্য এখনকার মতো ছিল না। ছিল উন্মুক্ত প্রান্তর,—গাছ পালা নেই, বন্ধ্যা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার এখানে এসে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন এবং দু'টি গাছের ছায়ায় তাঁবু খাটিয়ে এখানে কিছুকাল বিশ্রাম করে যান। প্রকৃতির এই নির্জন প্রান্তর ক্রমশ মহর্ষির চিত্ত অধিকার করে বসল। এখানে হলো বেল ফুলের বাগান, সারি বেঁধে বৃক্ষ রোপণ করা হলো। আদর্শটা প্রাচীন কালের তপোবনের। আশ্রমের জন্যে মহর্ষি বার্ষিক দু' হাজার টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। মহর্ষি যে সপ্তপর্ণী গাছের তলায় বসে সাধনা করেছিলেন,

আশ্রমের প্রান্তে তা এখনো বিদ্যমান, তার পরেই অবারিত, উন্মুক্ত দিগন্ত, দৃষ্টিকে পথ ভুলিয়ে, সীমা ভুলিয়ে আত্মহারা করে দেয়।

মহর্ষি যেখানে বসে তপস্যা করেছিলেন, সে স্থানটি চিহ্নিত করবার জন্যে সেখানে একটি মর্মরফলকে এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ আছে—"তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।"

আশ্রমটি মহর্ষি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের ভগবচ্চিন্তার জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন। কেবল অন্য ধর্মের নিন্দা, ইতর আনন্দ এবং মাংসাহারই এখানে নিষিদ্ধ ছিল।

প্রায় ত্রিশ বছর ধরে শান্তিনিকেতনে কোনো কর্মপ্রবাহ ছিল না। মন্দিরে কদাচিৎ উপাসক অতিথির সমাগম হতো। একজন বেতনভোগী পুরোহিত ছিলেন, তিনি দৈনন্দিন উপাসনার কাজ কোনক্রমে সমাধা করতেন।

ত্রিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে মহর্ষি তাতে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন। ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ এখানে 'বিদ্যালয়ে'র উদ্বোধন করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি অফুরন্ত স্বাধীন স্ফূর্তির মধ্যে ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া—যাতে তারা পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল আরো গভীর। কবির রচিত অনেক প্রবন্ধ কবিতায় তার সাক্ষ্য রয়েছে। 'Message of the Forest' রবীন্দ্রনাথের মর্ম আমূল স্পর্শ করেছিল, তারই আদর্শকে পুনরুদ্ধার করবার মহৎ আশায় তিনি তাঁর সমস্ত জীবন অর্পণ করে গেছেন। 'শিক্ষা সমস্যা' নামক বাঙলা প্রবন্ধেও কবি এই আদর্শেরই ব্যাখ্যা করেছেন।

তাঁর মনে আরো একটি আদর্শ ছিল। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের স্বপ্ন তাঁর বহুদিনের, এতে শিক্ষাটা জীবনের সঙ্গে সহজ

হয়ে ওঠে। বাঙলার লোকসাহিত্য ও প্রবাদ পুনরুদ্ধারের জন্যেও তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়; পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। জগদানন্দ রায়ও তাঁর সহযোগী হলেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত জগদানন্দ রায় বিশ্বভারতীর সেবা করে গেছেন।

প্রথম প্রথম ছাত্রদের নিকট হতে কোন ফী গ্রহণ করা হতো না। শিক্ষার মন্দিরে ব্যবসাদারিকে প্রশ্রয় দান কবির অভিপ্রায় ছিল না। তাঁর নিজের অর্থ হতেই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হতো। পরবর্তী কালে অবশ্য বাধ্য হয়েই কবিকে ফী-এর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল মাসিক ১৫৲ টাকা।

বহুদিন পর্যন্ত কবি দেশের লোকের মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারেন নি। প্রতিষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্যটি ছিল অনেকেরই অজানিত। অনেকের ধারণা ছিল, এটা কবির খেয়াল, আবার অনেকে এটাকে পাশ্চাত্য জীবনধারার বিরুদ্ধে কবিমনের প্রতিক্রিয়া বলেই গণ্য করতেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্যে ব্রহ্মবান্ধব একবছর পরেই বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে দিলেন। তৃতীয় বছরে আর একজন শক্তিশালী কর্মী এলেন শান্তিনিকেতনে। ইনি কবি সতীশচন্দ্র রায়। ১৯০৪ সালে শান্তিনিকেতনে এঁর মৃত্যু হয়। সেই বছরই মোহিতচন্দ্র সেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করলেন। কিন্তু গুরুতর পরিশ্রমে তাঁরও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হলো। ১৯০৫ সালে তিনি বিশ্বভারতীর কাজে অবসর নিলেন,—কিছুকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হলো।

এই সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হলো। কবি স্বদেশী আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করলেন। কিন্তু রাজনীতির এই কোলাহলের মধ্যেও তিনি পল্লীর আহ্বান শুনতে পেতেন,—তাঁর

ধ্রুব ধারণা ছিল—পল্লীপ্রাণের মুক্তির মধ্যেই দেশের কল্যাণ, নচেৎ মুক্তি নেই। তাই আন্দোলনের মধ্যেই একদিন সহসা শান্তিনিকেতনের নীড়ে ফিরে এলেন, অখণ্ড অধ্যবসায়ের সঙ্গে একে গড়ে তোলবার জন্যে প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করলেন। এই সময় অজিত চক্রবর্তী বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৯১৮ সালে পরলোক গমন করা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম ও লেখনী পরিচালনা করে আশ্রমের উন্নতি সাধন করে গেছেন।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ বিলেতে গেলেন। তাঁর যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে 'আশ্রমিক সঙ্ঘ' নামে প্রাক্তন ছাত্রদের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো আশ্রমের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা। কিছুকাল পরে সি. এফ. এণ্ডরুজ এবং পিয়ার্সন সাহেব এদেশে এলেন এবং আশ্রমের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯৩৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের ছাত্রদের কাছে 'বিশ্বভারতী'র আদর্শ উন্মোচন করলেন—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকং নীড়ম্।"—এখানে বিশ্ব মিলিত হবে।

বিশ্বমিলন কেন্দ্র হলেও দেশের মাটির সঙ্গে সুদৃঢ় যোগসূত্র থাকবে 'বিশ্বভারতী'র, গোড়া থেকেই কবির মনে ছিল এই ভাব। তাই পরিকল্পনার আদিতেই তিনি বলেছিলেন—"সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় নাই। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির

উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত হইবে। এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"

কবির এই বক্তব্য থেকেই এ কথা সুপ্রমাণিত যে তাঁর বিশ্ববোধ ও জাতীয়বোধের মিলিত অনুপ্রেরণার ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বিশ্বভারতী'।

এর পর থেকে শৃঙ্খলার সঙ্গে 'বিশ্বভারতী'তে বিবিধ শাস্ত্রের অধ্যাপনা চললো। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ-রূপে যোগদান করলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এলে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় উক্ত পদে নিযুক্ত হলেন। শিল্প এবং চারুকলা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। ১৯১৮ সালে কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হলে পর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু তাতে যোগদান করলেন। সেই অবধি ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'কলাভবন' একটি সন্দেহাতীত আসন অধিকার করে আছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে রবীন্দ্রনাথ যখন পাশ্চাত্য ভ্রমণে বার হয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে আমেরিকাতে এলমহার্স্ট নামক একজন উৎসাহী যুবকের পরিচয় হয়। এলমহার্স্ট তাঁকে জানালেন যে, পল্লী-জীবনের সঙ্গে নগর-জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই সভ্যতার আদর্শ।

ফলে শ্রীনিকেতনের আদর্শটি রবীন্দ্রনাথের মনে অংকুরিত হয়ে উঠলো। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ শুরুলের কুঠি কিনেছিলেন। এইবারে এলমহার্স্টের হাতে সেখানে শ্রীনিকেতন সম্পর্কিত পরীক্ষার সুযোগ ছেড়ে দিলেন।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা হলো। পরে 'বিশ্বভারতী' রেজেষ্ট্রী করা হলো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দানপত্রে 'বিশ্বভারতী'কে তাঁর শান্তিনেকেতনস্থ যাবতীয় সম্পত্তির, তাঁর রচিত গ্রন্থাদির স্বত্ব এবং নোবেল প্রাইজের সমস্ত টাকা অর্পণ করলেন।

'বিশ্বভারতী'র প্রসার এখানেই থেমে যায়নি। নানাদিকে 'বিশ্বভারতী'র বিস্তারও হয়েছে। দেশবিদেশ থেকে খ্যাতিমান অধ্যাপকেরা এসেছেন অফুরন্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, উচ্চতম সরকারী কর্মচারীরাও বাদ যাননি। ফ্রান্স থেকে এসেছেন সিলভ্যা লেভি, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে মঃ উইন্টারনিৎস। নানা দেশের ধনকুবেরদের অর্থানুকূল্যে বহু বিভাগের উদ্বোধন হয়েছে। চীনবাসীদের সাহায্যে ১৯৩৭ সালে খোলা হয়েছে 'চীনাভবন'; কিছুকাল পরে 'হিন্দিভবন'। 'কলাভবনে'র উল্লেখ তো ইতিপূর্বেই করেছি। কিছুকাল পরে 'সঙ্গীতভবন'ও খোলা হলো। এই বিভাগের ভার নিয়েছিলেন কবির 'সকল গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওদিকে শ্রীনিকেতনে পল্লী উন্নয়নের কাজ সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। কৃষির উন্নতি এবং সমবায় পদ্ধতিতে পল্লীস্বাস্থ্য-সমিতির কাজও সাফল্যের সঙ্গেই এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া শ্রীনিকেতনের প্রধান গৌরবের বিষয়ই হলো বিবিধ শিল্পের পুনরুজ্জীবন। বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, কাঠ এবং চামড়ার কাজে শ্রীনিকেতনের সাফল্য বিস্ময়কর। ভারতের সর্বত্র আজ শ্রীনিকেতনে তৈরি জিনিসের চাহিদা।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বলেছেন,—"তখন রথী ও মীরা হয়েছে, আমাদেরও ছেলেমেয়ে হয়েছে। তাদেরকে ভালো রকম শিক্ষা দিতে হবে। কোথা থেকে রবিকা' অবিনাশবাবুকে খুঁজে বের করে নিয়ে এলেন। স্কুল বসলো। কী সাবজেক্ট পড়াতে হবে, কখন পড়াতে হবে, কি খেলা দিতে হবে—সব তিনি ঠিক করলেন। স্কুলে মাত্র গোটাকয়েক ছেলেমেয়ে। তারা ছবি আঁকছে, গানের সুর টানছে, খাতা লিখছে। ছেলেমেয়েদের উপর তাঁর টান ছিল ভারি বেশি। মনের ভিতর বরাবর তাদের শিক্ষার কথা জপছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আনন্দের ভিতর দিয়ে শিখবে—এই ছিল তাঁর আদর্শ। তারপর শান্তিনিকেতন করলেন, নাম দিলেন ব্রহ্মবিদ্যালয়। মহর্ষি তখনো বেঁচে আছেন। গুটি ২।৩ ছোট ছোট ছেলে নিয়ে তার গোড়াপত্তন। এতটুকু ছেলের প্রাণের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল। ছেলেমেয়েরা খেলতে শিখবে, পড়তে শিখবে, আঁকতে শিখবে, গাইতে শিখবে, এমন কি সংসার করতেও শিখবে! কিন্তু মূল শিকড়ে যেন ঘা না লাগে। একখানি হাত ভেঙ্গে গেলে কেউ গড়তে পারবে না।

"প্রথম যখন শান্তিনিকেতনে যাই, মহর্ষির বাগান বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি এই ভাব নিয়ে গিয়েছিলুম। রবিকা'ও সঙ্গে। সন্ধ্যার সময় স্টেশনে পৌঁছলাম। আলো, পাল্কি, গোরুর গাড়িসহ মেঠো রাস্তা দিয়ে চলেছি। আলো আর অন্ধকারে মিশে ডোরাটানা সাপের মতো দেখাচ্ছিল। গুরুলের দিকে খানিক এগুতেই মনে হলো যেন বেদমন্ত্রের ধ্বনি শুনলুম। ভাবলুম, সন্ন্যাসীরা বুঝি মন্ত্রটন্ত্র আওড়াচ্ছে। একজন বললে—এটা বালির সঙ্গে গোরুর গাড়ির ঘর্ষণের শব্দ। রবীন্দ্রনাথ ধ্বনি শুনে মুগ্ধ হলেন। ঠিক হলো সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। সেটা

'সেক্টেরিয়েন' হবে না, সর্বসম্প্রদায় ও সকল জাতির প্রার্থনা-ঘর হবে। মন্দিরের রূপ দেওয়ার ভার আমার উপর পড়ল। আমি একটি ডিজাইন দিলাম। কিন্তু সেটা টিকল না। ইঞ্জিনিয়ার বললে—ওখানে পাথরের গাঁথুনি টিকবে না। টিকবে শুধু লোহা। তাই লোহা আর রঙ্গিন কাচ দিয়ে মন্দির তৈরী হলো। ৭ই পৌষ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন স্থির হলো। তিন সমাজের লোককেই নিমন্ত্রণ করা হলো। যাত্রা, আতসবাজি পোড়ানো প্রভৃতি দেখা ও খাওয়া-দাওয়ায় আমরা মশ্‌গুল ছিলুম।

"তারপর শান্তিনিকেতনের নক্সা আঁকবার জন্যে আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল। মহর্ষি চোখে দেখতে পেতেন না। লাল নীল সবুজ রঙে বড়ো করে মন্দিরের নক্সা তাঁকে দিলুম। ছাতিম তলায় ফোয়ারার প্ল্যান আমি দিয়েছিলুম।

"সেখানে 'কলাভবন' হওয়ার পর আর একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলুম। দেখলুম, শান্তিনিকেতনের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। নন্দলাল বসুর মতো বড়ো আর্টিস্টের হাতে পড়ে শান্তি-নিকেতন অন্য রকম হয়েছে। উত্তরায়ণের বাড়ি, পিয়ার্সন সাহেবের বাড়ি এবং আরো অনেক বাড়ি হয়েছে। দেখলুম, জগদানন্দবাবু মাধবীলতার তলায় বসে ম্যাথেমেটিকস্ পড়াচ্ছেন। আমার হাসি এলো। মাধবীলতার তলায় ম্যাথেমেটিকস্! কী আর বলব, একদিকে পিয়ার্সন সাহেব, অন্যদিকে এমহার্স্ট সাহেব। সাহেব গুলো পর্যন্ত খালি পায়ে, ইজার পরে ঘুরছে। কত দেশের মানুষ একত্র হয়েছে, ছোট খাটো একটি পৃথিবী গড়ে উঠেছে। সব গড়ছে, কিন্তু কিছুই শেষ হচ্ছে না—এ যেন ছেলের খেলা—কিছুতেই শেষ হতে চায় না। মজার স্কুল—স্কুল, না ঘর, না নিজের বাড়ি, না আনন্দের মেলা—বোঝা শক্ত। বড়ো বড়ো চোখ, হরিণের মতো কান—শান্তিদেবকে বাঁশী বাজাতে দেখলুম।

"তারপর আর একবার সেখানে গিয়েছিলুম। দেখলুম ছেলেরা

মূর্তি গড়ছে। আমেরিকার একটি মেয়ে শিশু-স্কুল চালাচ্ছে। রিভলভিং চেয়ারে বসে কবি লিখছেন। শিক্ষক ও ছেলেরা যেভাবে থাকে তিনিও তেমন ঘরে থাকতেন। গ্রামের পোস্ট মাষ্টারের ঘরের মতো। বেড়াবার সময় তাঁকে বললেন--শান্তিনিকেতনের মূলে কুঠারাঘাত হচ্ছে! সিংহ তার শাবক সম্বন্ধে ভয় পেলে যেমন হয়, আমার কথায় তাঁর মূর্তি তেমন হলো। আমি বললেম—শিশু-বিভাগে আমেরিকান 'সিস্টেমে' শেখালে হবে না, আমাদের দেশের মতো শিক্ষা দিতে হবে। তাঁকে সেদিকে একটু নজর দিতে বললেম। কয়েকদিন পর শুনলুম—আমেরিকান মেয়েকে সরিয়ে অন্য লোকের উপর শিশু-ক্লাশের ভার দেওয়া হয়েছে।"

বিদেশী পর্যটক আঁদ্রিনে মূর বিশ্বভারতীকে উল্লেখ করেছেন 'কবির স্বপ্ন' বলে। 'কবির স্বপ্ন' তো বটেই, কিন্তু বিশ্বভারতীর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হলো এই যে, এটা 'কর্মীর সাধনা'। 'বিশ্ব-ভারতী'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন বিশ্বের সমস্ত জাতিকে এক 'মহা-মানবের সাগরতীরে' মিলিত হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, শ্রীনিকেতনের মধ্যেও তিনি তেমনি এই দরিদ্র দেশের নিরন্ন জনসাধারণের জন্যে আটপৌরে কাপড় এবং দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করে দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন যে, জাতিকে যদি তিনি স্থায়ী কিছু দান করে থাকেন সে হলো 'শ্রীনিকেতন'। তাঁর কাব্যও যদি কখনও বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যায়, 'শ্রীনিকেতন' তো থাকবেই,—তাঁর কর্ম ও সাধনার উত্তরসাক্ষ্য! তাঁর যতখানি সাধ্য ছিল, সাধ ছিল তারও বেশি, কবির চেয়ে কর্মী হিসাবে বেঁচে থাকার আগ্রহ ছিল প্রবলতর। 'তাজমহল' যদি হয় শাজাহানের 'মর্মরস্বপ্ন', রবীন্দ্রনাথের 'কর্ম-স্বপ্ন' তবে 'শ্রীনিকেতন'। তাঁর রচিত সাহিত্য লুপ্ত হয় তো হোক, 'শ্রীনিকেতন' শুধু একবিন্দু নয়নের জলের মতো কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে থাকুক, তাঁর মনের আশা ছিল এই।

রবীন্দ্রনাথ আজ নেই, কিন্তু তাঁর 'বিশ্বভারতী' আছে। 'বিশ্বভারতী'র মধ্য দিয়ে তিনি যে স্বপ্ন সফল করতে চেয়েছিলেন তার পরিণতির আজও অনেক বাকি। স্বাধীন দেশে জাতীয় সরকারের পরিচালনাধীন হওয়া সত্ত্বেও এখনও তাতে অনেক ত্রুটি, অনেক সংশয়, অনেক বাধা। আজ দেশবাসীর কর্তব্য হলো কবির প্রারব্ধকে পরিণতির পথে নিয়ে যাওয়া, অকুণ্ঠিত সাহায্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলা। জওহরলাল নেহেরু একদা বলেছিলেন, 'শান্তিনিকেতন' না দেখলে ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। গান্ধীজি লিখেছেন, 'শান্তিনিকেতন'ই ভারতবর্ষ! কিন্তু এ হলো শান্তিনিকেতনের অন্তরঙ্গ রূপ। আমাদের দেখতে হবে বাইরের কর্মধারার মধ্যেও সে সার্থক হয়ে উঠেছে কিনা।

ইংরেজেরা বলে, ইটনের খেলার মাঠেই তারা 'ওয়াটারলু' জয় করেছে। 'বিশ্বভারতী'র আদর্শকেও আমরা যদি পরিণত সার্থকতার পথে অগ্রসর করে দিতে পারি, তবে আমাদেরও একদিন একথা বলা হয়ত অসম্ভব হবে না যে, শান্তিনিকেতনের ক্রীড়াভূমিতেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ বীর-সন্তানেরা মানুষ হয়েছে।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আলোচনা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতোই অসম্পূর্ণ। মানব-সংস্কৃতির প্রতিটি বিভাগ যাঁর কল্যাণ-স্পর্শে মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে এবং যিনি নিজেই ঠিক করে উঠতে পারেন নি 'কোন্‌টা আমার আসল কাজ' তাঁর সম্বন্ধে যে কোনো বর্ণনাই অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। কবিই বলছেন, "এক এক সময় মনে হয়, আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারিনে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক এক সময় মনে হয় আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়েরি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো; বোধ হয় তাতে ফলও আছে, আনন্দও আছে। এক এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর-কেউ করছে না তখন কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তব্যটা গ্রহণ করতে হয়—আবার এক এক সময় মনে হয়, দূর হোক গে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন; মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোট ছোট কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক।···যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয়, এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না; আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই কী, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্য বিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয়, এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা

যদি বলতে হয়—তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। ·····একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধে—বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সবচেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন; আমার ছেলেবেলাকার, আমার বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী।" রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রতিভার ইঙ্গিত রয়েছে এই আত্মবর্ণনায়। যেহেতু তিনি অনন্যসাধারণ, বিরাট এবং অপ্রমেয়, এবং আমাদের দেখবার রীতি অতিমাত্রায় সংকীর্ণ, সুতরাং তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলেই সেটা প্রাদেশিক হতে বাধ্য। তবে আমাদের ভরসা এই, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ অমৃতসমান, এবং বক্তা যিনিই হোন না কেন, শ্রোতা প্রসঙ্গগুণে পুণ্যবান আখ্যার অধিকারী নিশ্চয়ই। আর বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথের জীবনী এমনই চিত্তাকর্ষক ও বিচিত্র যে, ইতিপূর্বে কী বলেছি এবং কী বলিনি, তার কোনো সালতামামি গ্রহণ করবার আবশ্যক করে না।

রবীন্দ্র-জীবনের প্রধান প্রধান দিকগুলোর আলোচনা ইতিপূর্বেই সাধ্যমতো যথাস্থানে করেছি। এখানে তাঁর ব্যক্তিত্বের আর কয়েকটি দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবার চেষ্টা করবো।

মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কী রকম ছিলেন, সে সম্বন্ধে জনসাধারণের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের কোনো পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আর Bradley সাহেব তো বলেই দিয়েছেন যে, 'মানুষ সেক্সপীয়র', 'মানুষ শেলী' ইত্যাদি আখ্যা ভ্রমাত্মক। কেননা, যে মানুষ লেখে, তার ব্যক্তিসত্তা তার থেকে আলাদা হতেই পারে না! রচনার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ পরিচয় ধরা পড়েছে, এর বাইরে তিনি 'মানুষ' হিসাবে কেমন ছিলেন, এ প্রশ্ন শিথিল দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্রয় দেয়।

রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা একবার চোখে দেখেছেন, তাঁরাই জানেন

কী অলৌকিক দেহ-সৌষ্ঠবের অধিকারীই না ছিলেন তিনি। বস্তুত ইতিহাসে এমন যোগাযোগ কদাচিৎ দেখা যায়। সক্রেটিস শুনেছি রীতিমতো কুৎসিত ছিলেন, সেক্‌সপীয়রের প্রচলিত প্রতিচ্ছবি থেকে তাঁকে ঠিক সাক্ষাৎ কন্দর্প বলে ভুল করা শক্ত। মিল্টন, শেলী, এঁরা রূপবান ছিলেন বলে শুনেছি। কিন্তু এঁদের কারুর মধ্যেই লালিত্যের কমনীয়তার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ঋজুতার এমন সমন্বয় হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। রবীন্দ্রনাথ দেখতে কেমন ছিলেন, এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা মনে আসবে সেটা হলো এই যে, 'দেবতা'র মতো ছিলেন ; কিন্তু আসলে 'দেবতা' বিশেষণটি অর্থহীন। কেননা, দেবতা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নেই। অভিজ্ঞতা নেই বটে, কিন্তু আইডিয়া আছে। কিছু পড়ে কিছু শুনে মনে মনে আমরা সবাই দেবতার একটা কল্পিত রূপ গড়ে তুলেছি এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমাদের সেই মনগড়া রূপেরই প্রতিরূপ দেখে ধন্য হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ রূপবান ; অপরূপ রূপবান। শুধু প্রাচ্যবাসীর চোখেই নয়, বিদেশীর চোখেও। শিল্পী রোদেনস্টাইন যখন এদেশে এসেছিলেন, তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই আলাপ হতো। রোদেনস্টাইন জানতেন না রবীন্দ্রনাথের পরিচয়, শুধু তাঁকে চোখেই দেখেছিলেন। পরবর্তী কালে রোদেনস্টাইন স্বীকার করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের অসামান্য সৌন্দর্য তাঁর শিল্পচিত্তকে প্রথম থেকেই মুগ্ধ করেছিল।

এতো গেল বাইরেকার রূপ। তাঁর অন্তরের রূপ কী ছিল, তার পরিচয় আছে তাঁর অজস্র রচনায়, ঐশ্বর্যে বিকীর্ণ হয়ে।

কর্মী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি। তাঁর অনলস কর্মসাধনার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করবো। দিনে শয্যাগ্রহণ তাঁর কাছে ছিল অকল্পনীয় এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ ছিল তাঁর আজীবনের অভ্যাস। একদিন মাত্র সেই

অভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটেছিল। একটি দিন মাত্র পৃথিবীর রবির উদয়ের পূর্বে আকাশের রবির উদয় ঘটেছিল সেজন্যে কী অনুশোচনাই না তিনি ভোগ করেছেন! নিতান্ত কাজ-পাগল ছিলেন বলেই কবি রবীন্দ্রনাথকে কেরানী রবীন্দ্রনাথ রূপে দেখেও আমরা তেমন বিস্মিত হইনি।

তাঁর আরো কতগুলো ছোট ছোট পরিচয় আছে, যা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি অসাধারণ মিশুক ছিলেন। যাঁরাই জীবনে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরাই মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করেছেন যে, মানুষকে আদর-আপ্যায়ন করার সামাজিকতায় আর আসর জমাবার বিশেষ কৌশলে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। গুণ গুণ করে গান করে,—গল্পে, হাস্য-পরিহাসে তিনি অতিথি-অভ্যাগতদের এমন মশগুল করে রাখতেন যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলক্ষ্যে অতিবাহিত হতো। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট অথচ তীব্র, প্রসঙ্গক্রমে একথা জানিয়ে রাখি। স্বদেশী যুগে তিনি স্বয়ং সভায় সভায় গান গেয়েছেন, বোলপুরে ছাত্রদের অনেক সময় স্বয়ং গান শিখিয়েছেন। ছাত্রদের সঙ্গে আপনভাবে মিশতে তিনি খুবই ভালবাসতেন, প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর একটা নিজস্ব সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্ক গুরুশিষ্যের নয়, তার মাধুর্য ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে দুটি প্রাণের মুখোমুখি দাঁড়ানোয়। কবি যে কিরূপ অতিথি-বৎসল ছিলেন, অভ্যাগতদের আপ্যায়নে তাঁর যে কত আনন্দ হতো তার চমৎকার বর্ণনা রয়েছে শান্তা দেবী রচিত তাঁর পিতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী-গ্রন্থে।

তিনি সামাজিক ছিলেন, একথা ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়, যখন দেখি যে, তাঁর সাথিত্ব করবার উপযুক্ত লোকের কী মর্মান্তিক অভাবই না ছিল এই দেশে; স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় বলেছেন যে, বামনের দেশে তিনি ছিলেন দৈত্যবিশেষ, তাই বারংবার মহৎচিত্তের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করতে তাঁকে

বারংবার ছুটে যেতে হয়েছে বিদেশে। সেখানে পেয়েছেন বৃহৎ মানবমনের আতিথ্য। অথচ মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন এই দেশের। এদেশের মাটির পায়ে তাঁর মাথা নুয়ে পড়েছে, এদেশের ভাই-বোনদের এক করবার জন্যে কী আগ্রহই না তাঁর ছিল।

রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ বিনয়ী ছিলেন। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি তর্জমা করেই তিনি 'নোবেল' পুরস্কার পেয়েছিলেন, এ কাহিনী সকলেরই জানা। অথচ বরাবরই তাঁর ধারণা ছিল, তিনি ইংরেজি লিখতে জানেন না। দেহত্যাগের কিছুদিন আগে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখেছেন, ইংরেজি আমি লিখি 'কানের অভ্যাসে'। তাঁর ইংরেজি রচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁদেরই জানা আছে, এই কানের অভ্যাসেই তিনি কত সুন্দর ইংরেজি লিখতেন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের আর একটি দিকের উল্লেখ না করলে আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি চিকিৎসায় দক্ষ ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল, একথা তিনি নিজেই বলেছেন। রোগীদের বিনে পয়সায় ব্যবস্থা দিয়ে তিনি খুবই আনন্দ পেতেন। আর তাঁর ওষুধে রোগী ভালো হয়ে উঠলে সে আনন্দের তো সীমাই থাকত না। তিনি বলতেন, 'ফী নিইনে বলেই আমার নাম হয় না।' রোগীর শুশ্রূষা করে করে তিনি এমনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগের কাছ ঘেঁষতেও ভয় পেতেন না।

রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কৌতূহল আছে। থাকা অস্বাভাবিকও নয়। প্রথমত, এই generation-এর কারুর কবির দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। সে সময় যাঁরা কবির সুহৃদ ও সহচর ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা অনেকেই এখন পরলোকে। দ্বিতীয়ত, কবি স্বয়ং এ সম্পর্কে একেবারে নীরব। তাঁর খুব কম রচনাতেই তাঁর দাম্পত্যজীবনের

আভাস পাই। এমন কি প্রিয়া-বিয়োগে রচিত সাতাশটি শোকগাথার সংকলন 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থখানির কোথাও ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত হয়নি। এই নীরবতাই রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য-জীবনকে রহস্যময় করে তুলেছে। ১৩৪৭ সালের এক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সৌভাগ্যক্রমে সেটির মারফৎ আমরা কবির ব্যক্তিগত জীবনের কিছু আভাস পেয়েছি। তাঁর গৃহস্থালীর যে-সব মনোরম চিত্র লেখিকা আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তার জন্যে বাঙালী পাঠক সমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। এই প্রবন্ধের মারফৎ জানা যায়, কবিপত্নী অসুস্থ হলে কবি স্বয়ং তাঁর শুশ্রূষা করেছিলেন। ভাড়াটে নার্সের হাতে একদিনের ক্লান্তিতেও সে ভার অর্পণ করেননি। রবীন্দ্রনাথ কেন যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এতখানি নীরব, উল্লিখিত প্রবন্ধের বর্ণনার মারফৎ যেন তার কারণ বোঝা যায়। বোঝা যায়—স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এতই নিবিড় ছিল যে, দশ জনের কাছে তা ঘটা করে প্রকাশ করতে কবি আঘাত পেতেন। এক কথায় তা ছিল—too deep for tears. তবে কবিচিত্তে কবিপ্রিয়ার স্মৃতি যে চিরজাগ্রত ছিল নানা প্রসঙ্গেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। উর্মিলা দেবী একটি ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন, "কবিপ্রিয়া স্বর্গতা হবার অনেকদিন পর কি একটা কারণে কবির সংসারে একটা ক্ষণিক বিপ্লব ঘটে। তখন একদিন তিনি আমার মেজদিদি-[অমলা দাস]-কে বলেছিলেন, 'দেখো, অমলা, মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোনো-একটা সমস্যায় পড়ি, যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন।

এবারেও আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।'…

মৃণালিনী দেবীকে লিখিত কোনো কোনো পত্রেও কবির পত্নী-প্রেমের গভীরতার আভাস মেলে। কলকাতায় পারিবারিক গোলমালে ছোটবধূ অশান্তি ভোগ করছেন জানতে পেরেই কবি চিঠিতে মৃণালিনীকে উপসংহারে লিখলেন, "আমি কলকাতার স্বার্থ-দেবতার পাষাণমন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে…উৎসুক হয়েছি।" তারই কিছুকাল পরে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে আসা হয় শিলাইদহে নিজের কাছে এবং কবি সেখানে আপন সন্তানদের শিক্ষার জন্যে করেন গৃহ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

পিতা-মাতা ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠ-জ্যেষ্ঠাদের প্রতি কবির ভক্তি-নিষ্ঠা ও ভালোবাসার কথা সংক্ষেপে কিছু কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। তা ছাড়া আপন সন্তানসন্ততি এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদের জন্যে অগাধ স্নেহমমতায় যে তাঁর অন্তর ছিল ভরপুর তার দৃষ্টান্তও প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে। কিন্তু এখানে যে কথাটি বলা দরকার তা হলো 'সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তি'ই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য, তাই সংসারের মায়াবন্ধনে তিনি কখনো মোহান্ধ হয়ে পড়েন নি। জীবনের প্রথমার্ধে পরপর বহু শোকের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু 'পৃথিবীতে যাহা আসে, তাহাই যায়' এই মহাসত্য যাঁর সবিশেষ জ্ঞাত কোনো শোকই তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে না, কোনো বেদনাই তাঁর সৃষ্টির বেগকে ব্যাহত করতে সমর্থ হয় না। বাস্তবিক পক্ষে গীতায় উক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সর্বলক্ষণযুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং তাঁর সৃষ্টির বিপুলতার প্রেরণা-উৎসও ছিল আত্মানন্দ, প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ জনই যার অধিকারী। কবি লিখেছেন, "মন শান্ত না থাকিলে আমি কোন কাজ করিতে পারি না। সেইজন্য জীবনকে নিষ্ফলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকলপ্রকার ক্ষোভের কারণ হইতে দূরে থাকিবার

চেষ্টা করি।" দুঃখে নিরুদ্বেগ, সুখে বিগতস্পৃহ এবং বীতরাগভয়-ক্রোধ হয়ে শান্ত থাকাই স্থিতপ্রজ্ঞের প্রধান লক্ষণ এবং রবীন্দ্রনাথ যথার্থই তাই ছিলেন।

যা কিছু মহান, যা কিছু প্রাণশীল তার সঙ্গেই ছিল তাঁর প্রাণের যোগ। এদেশের সংস্কার আর জড়তার 'অচলায়তন'কে তিনি বারংবার ধিক্কার দিয়েছেন তাঁর রচিত নাটকে, প্রবন্ধে, কাব্যে। 'শিকল দেবী'র পূজা-বেদীতে তিনি পাগলামিকে দুয়ার ভেদ করে আসবার আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেছেন। এই দুর্ভাগা দেশের অশিক্ষা দূর করবার জন্যে স্বয়ং লোকশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীনিকেতনের মাঠে তাঁর স্বপ্ন ছড়ানো, তাঁর বাণী অদৃশ্য অক্ষরে লেখা রয়েছে শান্তিনিকেতনের প্রতিটি ভবনের দেয়ালে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু নিজ পুত্রের বিবাহ ব্যাপারে তাঁর অতুলনীয় পিতৃভক্তিও গগনেন্দ্রনাথের ভগ্নী বিনয়িনী দেবীর বিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনয়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। ঠাকুরবাড়িতে এই প্রথম বিধবা-বিবাহ। শুধু সাহিত্যে নয়, কার্যতও ভারতের মূক অবগুণ্ঠিত নারীর হয়ে এমনিভাবেই তিনি বিদ্রোহ জানিয়েছেন, ভারতের অসংখ্য জনগণের কণ্ঠে দিয়েছেন ভাষা। আজকের বাঙালীর যে ভাষা, সে ভাষাও তাঁরই দান। নির্জীব জড়পিণ্ডের মতো শব্দ-সমষ্টিগত ছিল যে ভাষা, তাতে তিনি একটা প্রাণময় তির্যকতা এনেছেন; যে স্তর থেকে যে স্তরে পৌঁছতে ইংরেজি সাহিত্যের দু'শো বছর লেগেছে, একা রবীন্দ্রনাথের সাধনায় বাংলা সাহিত্য সেই পর্যায়ে পৌঁছেচে। তাঁর দেওয়া বৈদ্যুতিক দ্যুতিই বাংলা সাহিত্যের কণ্ঠে অম্লান। বক্তা হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন, তাঁর বক্তৃতা যাঁরা না শুনেছেন তাঁদের কোনো কথা বলেই এ প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়।

তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি ছিলেন লোকোত্তর

মহামানব—ইতিহাসের এই অর্ধসভ্য কদর্য অধ্যায়ের পক্ষে তিনি এক হিসাবে আধুনিক সংস্কৃতির fore-runner ছিলেন। ইংরেজিতে বলা যায়—He was like a brilliant phrase in a dull sentence. এই হানাহানির মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাঁর জ্যোতির্ময় রূপ ছিল বেমানানো। জীবনের নশ্বর রূপে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, তাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখেননি। জীবনের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ছেদহীন অখণ্ড বিরাট একটি প্রবাহের স্বরূপ, যা মৃত্যুর তুচ্ছতাকে উপেক্ষা করে, লোকান্তরে মহত্তর আলোকের অভিসারে যার নিরন্তর যাত্রা। এই নশ্বর ধরার ধূলিতে তিনি তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি রেখে গেছেন,—কিন্তু নিজে তার বন্ধনে বাঁধা পড়েননি। তাঁর চিরন্তন স্বরূপ এই ঘাটের লেনাদেনা চুকিয়ে অপর পারে যাত্রা করেছে। তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করে আমরাও বলতে পারি,—

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই॥

কিন্তু তবু আমরা আশা করবো, তাঁর পুনরাবির্ভাবে আরেকবার ধন্য হোক এই বাঙলা দেশ! কারণ কবিই লিখেছিলেন—

পরজন্ম সত্য হলে
কি ঘটে মোর সেটা জানি।
আবার আমায় টানবে ধরে
বাঙলা দেশের এ রাজধানী।

রবীন্দ্রনাথের যৌবন-মধ্যাহ্নের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হোক, সার্থক হোক।